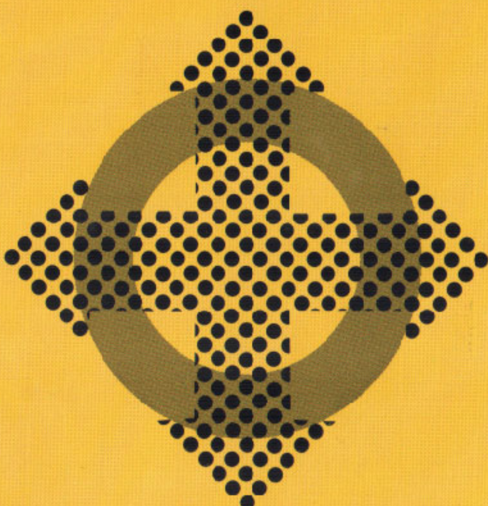
শে খ হা সি না

বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা





চিন্তাভাবনা', 'জনগণ ও রাজনীতি', 'বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন'এবং 'পিপল এন্ড ডেমোক্রেসী' ।

১৯৯৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনাকে আইনে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে । ৪ জুলাই জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে আইনে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয় । ২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাবারটে ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে । ১৯৯৯ সালে ২৮ জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি 'দেশীকোত্তম' প্রদান করে । ২০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সমাজসেবায় সৃজনশীল অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট অব ল' ডিগ্রিতে ভূষিত করে । শান্তি ও গণতন্ত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একই বছরের ১৮ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রিতে ভূষিত হন । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ব্রাসেলসের বিশ্বখ্যাত ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে । একই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব হিউম্যান লেটারস্-এ ভূষিত করে । রাজনৈতিক সাহসিকতা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫ বছরের সংঘাত নিরসন করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জণ্য ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে তিনি পান ইউনেস্কোর হুকে-বোইনি শান্তি পুরষ্কার ।

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা এক আদর্শবাদী দূরদর্শীসম্পন্ন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সরকার পরিচারনা করে তিনি যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সাফল্য এনে দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় এক দেশ হিসেবে প্রশংসা অর্জন করে বিশ্বে তার ভাবমূর্তি আবারও উজ্জ্বল করে তোলে। আপাদমস্তক রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব শেখ হাসিনা সর্বদাই তাঁর প্রিয় জনগণের প্রতি আত্মনিবেদিত। এই চেতনা তাকে প্রতি মুহূর্ত উজ্জীবিত করে রাখে জনগণের ভালবাসা ও বিশ্বাসে। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন এই দুটি শর্তই তার রাজনীতির প্রথম ও প্রধান অঙ্গীকার। ১৯৮১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত তিনি এক দুঃসাহসী নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে যেমন আত্মাবিশ্বাসী করে তুলেছেন, তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলেতেও এক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন। মেধা, শ্রম ও সৃজনশীলতা শেখ হাসিনার চারিত্রিক দৃঢ়তার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

লেখক হিসেবেও শেখ হাসিনার প্রাণবন্ত উপস্থিতি পাঠক মহলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে থাকে। দেশে জনগণ সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা তিনি তার তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। রাজনীতির ব্যস্ততায় তিনি বাঁধা থাকলেও তার প্রিয় পাঠকদের কথাও তিনি মনে রাখেন। এবারের প্রবন্ধগুলোয় তিনি ১ অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনে যে ষড়যন্ত্র ও কারচুপি হয়েছে এবং নির্বাচন পরবর্তী জামাত-বিএনপি জোটের যে সন্ত্রাসী পাশবিকতায় সধারণ মানুষ অসহায়ভাবে জীবন-যাপন করেছে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। বিপন্ন গণতন্ত্র ও লাঞ্ছিত মানবতা, এ অবস্থায় বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে–এ মুহূর্তে এটাই আমাদের সকলের ভাবনা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৮১ সালে তাঁকে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ২৫ বছর আগে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক-রাজনীতি সংক্রান্ত বই, সাময়িকী ও সাহিত্যের উন্মুখ পাঠক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে, 'ওরা টোকাই কেন', বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', দারিদ্র্দূরীকরণ ঃ কিছু

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৮ : ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Bipanna Ganatantra Lanchhito Manabata :
Threatened Democracy Violated Humanity ::
by Sheikh Hasina

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 BanglaBazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com

Second Print : February 2015

Price: Tk. 150.00 only

ISBN 978 984 04 1691 2

উৎসর্গ

জামাত-বিএনপি জোটের মানবতা বিরোধী
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিহত, আহত ও
নির্যাতিতদের উদ্দেশে

ভূমিকা

ভালবাসি মাতৃভাষা। বাঙালি জাতি হিসেবে রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি ভাষার অধিকার। রক্ত দিয়ে পেয়েছি স্বাধীনতা। ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও সফল করেছি। বারবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এদেশের মানুষ। আসলে মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে, সেটা হল— কি অপরাধ করেছে বাংলার মানুষগুলো যে, যারা বার বার বঞ্চনার শিকার হয়? কি অপরাধ তাদের? কেন তারা দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখতে পারবে না? সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে না? শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে না? যখনই কেউ তাদের হয়ে কাজ করবে তখনই তাকেও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে।

আমি যখন আমার দেশের মানুষের কথা ভাবি, ব্যথায় আমার বুক ভেঙে যায়। তাদের দু:খ, কষ্ট, যন্ত্রণা আমি মরমে উপলব্ধি করি। দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ চব্বিশটি বছর সংগ্রাম করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। স্বাধীন জাতির স্বাধীন স্বত্ত্বার উপর তিনি এদেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার আর বারবার আঘাত করে দেশকে পিছিয়ে নিচ্ছে। যখনই আমরা সংগ্রাম করে, লড়াই করে এগোতে চেষ্টা করছি, হয়তো একটু এগোচ্ছি। এবং এদেশের দু:খী সাধারণ মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, তখনই আবার আঘাত এসেছে। বাঙালি জাতিকে কি যুগ যুগ ধরে বার বার সংগ্রাম করেই যেতে হবে?

আমি লেখক নই, প্রবন্ধকার নই, দেশকে ভালবাসি, দেশের মাটি ও মানুষকে ভালবাসি। মানুষের জন্য প্রাণের টানে কাজ করে যাচ্ছি। আমি চাই আমাদের দেশের মানুষ সুন্দর জীবন-যাপন করুক। শান্তিতে বসবাস করবে, উন্নত জীবন পাবে। সুখ, শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে বাংলাদেশ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখনই কোন বিষয় নজরে এসেছে চেষ্টা করেছি কলম ধরতে। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন করেছি। পাঁচ বছর সফলভাবে দেশ পরিচালনা করে মানুষকে নতুনভাবে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলাম, সেটাই আমাদের সার্থকতা। কিন্তু দু:খের বিষয়, দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

এমনি পরিস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি, যে দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৯৯ সালে। আজ সমগ্র বিশ্ব পালন করছে এ দিবসটি। বিশ্বে মাতৃভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশের। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলারও প্রকল্প আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করে এবং জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান আমার

আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছি এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনে আমাদের রয়েছে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু পরাজিত শক্তির দোসররা ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্রে অব্যাহত রয়েছে। এই বিকৃত ইতিহাস জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা এঁটেছেন এদেশেরই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। বাঙালির বিজয় এরা মেনে নিতে পারে না বলেই বার বার আঘাত হানে। ষড়যন্ত্র করে, চক্রান্তের বেড়াজাল ফাঁদে। আর এদেশের মানুষ হারায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, হারায় উন্নত জীবনের স্বপ্ন।

আজ আবার এদেশের গণতন্ত্র বিপন্ন। ১ অক্টোবর ২০০১ সালের নির্বাচনে যে গভীর চক্রান্ত জনগণের ভোটের রায় কেড়ে নিয়েছে ব্যাপক কারচুপি করে এবং নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস, অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, দখল, চাঁদাবাজী মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অত্যাচারিত হয়েছে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অত্যাচারিত হয়েছে অগণিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, ভোটার। পাশবিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে নয় বছরের মল্লিকা থেকে সীমা, জোহরা, পূর্ণিমা, ৫০ বছরের বৃদ্ধাসহ হাজার হাজার মহিলা। মানবতার এত বড় অপমান, নির্বাচনের পর যা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। জনগণের ভোটে সত্যিকারভাবে জয়ী হলে কি মানবতাকে এভাবে লাঞ্ছিত হতে হত? ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল সত্যিকারভাবে। জনগণের ভোটেই জয়ী হয়েছিল বলেই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় নাই। হবার প্রয়োজনও মনে করে নাই। কারণ আত্মবিশ্বাস ছিল। জনগণের উপর আওয়ামী লীগের প্রচণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। তাই আজ দেখি গণতন্ত্র বিপন্ন বিপর্যস্ত। মানবতা ভূলুণ্ঠিত লাঞ্ছিত।

এমতাবস্থায় চেষ্টা করেছি আমার অনুভূতি ব্যক্ত করতে। কতটুকু পাঠকের মনকে নাড়া দেবে আমি তা জানি না। তবে আমার প্রচেষ্টা হল সত্য ঘটনাগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে। বিচারের ভার প্রিয়-পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

বই ছাপার দায়িত্ব প্রকাশক ওসমান গনি নিয়েছেন এই কঠিন সময়ে। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। বই ছাপা, প্রচ্ছদ, বাঁধাইসহ সকল কাজে যারা নিয়োজিত তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখা ও তথ্য সংগ্রহে কোন ভুল থাকলে কোন পাঠক যদি তা সংশোধন বা সংযোজন করার জন্য পাঠান, কৃতজ্ঞ থাকব। তাতে আমার লেখা আরও সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করি।

পাঠকের কাছে এ বই সমাদৃত হলেই নিজেকে সার্থক মনে করব।

শেখ হাসিনা

১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সূচিপত্র

আমার কলেজ-জীবন

স্কুলজীবন শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। সে কী উৎসাহ উদ্দীপনা। অধিকাংশ বন্ধু গভঃ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হচ্ছে। কাজেই আমিও সেখানে গেলাম, ফর্ম নিলাম, ভর্তি হলাম। বেশ কয়েকদিন অফিসে যেতে হল। পুরোনো কিছু স্কুলের বান্ধবী যারা আমাদের আগের বছর এসএসসি পাস করেছে, তাদের সাথে দেখা হল। ওরা অনেক সাহায্য করল। বেশ কয়েকদিন অফিসে দৌড়াদৌড়ি করাতে মোটামুটি কলেজ ক্যাম্পাসটা চেনা হয়ে গেল, বিশেষ করে ক্যান্টিনের সাথে পরিচিত হলাম। সাধারণত স্কুলে ক্যান্টিন থাকে না, কিন্তু কলেজে ক্যান্টিন, এক কাপ চা নিয়ে বসে গল্প করা অর্থাৎ রীতিমত চায়ের কাপে ঝড় তোলা বেশ মজার। রাজনীতির সাথে যারা জড়িত তারাও বেশ উৎসাহিত, আমি ভর্তি হচ্ছি দেখে।

এর কারণ হল মেয়েদের মাঝে ছাত্র ইউনিয়ন করার প্রবণতা বেশি। তার ওপর মতিয়া চৌধুরী তখন তুখোড় নেত্রী, তাঁর সংগঠনই বেশি শক্তিশালী। স্কুলে থাকা সময় থেকেই তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার কথা জানতাম। বিভিন্ন আন্দোলনে স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে বটতলায়ও গিয়েছি। তবে মনি ভাই সব সময় সতর্ক করতেন আমরা

আবার মতিয়া চৌধুরীর টানে যেন ভিন্ন রাজনীতিতে চলে না যাই। আমাকে ছাত্রলীগ করতে হবে। তবে আমার সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্ব সকলের ছিল। নিলুফার পান্না, মঞ্জু, নসিবুন, নিলুফার, রানু, হাসু, টুনটুনি, মাহমুদাসহ অনেক সিনিয়র মেয়েরা যারা ছাত্রলীগ করত তারা খুবই খুশি। ভর্তির সময় অনেক সাহায্য তারা করল। যাহোক ভর্তি হলাম।

প্রথম ক্লাস শুরুর দিন। খুবই উৎসাহ, সারা রাত যেন আর ঘুমই হয় না। সকালে উঠেই তৈরি হলাম। প্রথম দিন কলেজে যাব। নতুন সালোয়ার কামিজ মা তৈরি করে দিয়েছেন। খুবই সুন্দর প্রিন্ট, একেবারে নতুন বাজারে এসেছে। খুব হালকা রঙের মধ্যে, আমার দারুণ পছন্দ। বন্ধুবান্ধবীদের সাথে সময় ঠিক করে নিলাম, যাতে এক সঙ্গে কলেজে ঢুকতে পারি। আগেই খবর পেয়েছিলাম র‍্যাগিং করবে। কিন্তু কী করবে জানি না। কলেজের গেটের ভিতরে পা রাখলাম। কত স্বপ্ন, মনে কী উৎসাহ, ক্লাসে যাব। ক্লাসরুমগুলো খুঁজে নিতে হবে। রুটিন জানতে হবে, শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। মনের মাঝে একটা উদ্বেগও কাজ করছে। কলেজ-জীবনের প্রথম দিন। দারুণ উত্তেজনা, উদ্দীপনা।

মোটামুটি সবাই ঠিক সময় এসেছে। কেউ ভিতরে প্রবেশ করে গেটের পাশেই অপেক্ষা করছে। কয়েকজন বাইরে। আমরা কয়েকজন এক সাথে গেটে ঢুকলাম। কিন্তু যেই গেটের ভিতরে পা দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে ঝপাঝপ রং এসে চোখ-মুখ, কাপড়-চোপড় লাল রঙে ভিজিয়ে দিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রমণ। আচমকা আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলাম। এত শখের সুন্দর কামিজটা, সাদা সালোয়ার, সাদা ওড়না সব লাল। পুরো ভিজে গেলাম। চোখের চশমাটা ভিজে গেল। ওড়না ও রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছে নিলাম। এই ফাঁকে কী করণীয় তাও মনে মনে ঠিক করলাম। কাছেই এক বান্ধবী ছিল। হাতের বইগুলো ওকে ধরিয়ে দিলাম। দেখি বালতি ভরতি রং। সেখান থেকে মগে করে তুলে তুলে ছুড়ে মারছে। আমি কোনো কথা না বলে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে বালতির দিকে এগুতে থাকলাম। ইতোমধ্যে আরও কয়েক মগ রং আমার দিকে ছুড়ে মারল। কোনো

বাধা দিলাম না, প্রতিবাদ করলাম না। শুধু ওদের কাছে পৌঁছালাম বেশ হাসতে হাসতে। কারণ আমার মজাই লাগছিল। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে যে সময়। কাছে এগিয়ে যেই বালতিটা হাতের নাগালে এসেছে, চকিতে বালতিটা তুলে সব রং ওদের ওপর ঢেলে দিলাম। ওরা বোধ হয় পাল্টা আক্রমণে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। খুবই ক্ষেপে গেল। ওদের যত রং ছিল সবই আমরা ওদের ওপর ছিটালাম। তাতে আমাদের সিনিয়ররা ভীষণ ক্ষেপে গেল। কিছু বিহারি মেয়ে ছিল, নন বেঙ্গলি যাদের বলা হত, তারা দোয়াতের কালি নিয়ে এল। এক পর্যায়ে তাও কাড়াকাড়ি হল এবং বেশির ভাগ তাদের গায়েই গেল। এতে ওরা গেল আরও ক্ষেপে। এদিকে আমাদের ওপর যে রং—কিছুক্ষণ পর দেখি রং আর নেই। বেশ বোকা বানাল আমাদের। নন বেঙ্গলিগুলো ভীষণ ক্ষেপেছে আমার ওপর। অনেকক্ষণ তারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, যদিও আমি পুরোনো দালানে উঠে বসে মজা দেখছিলাম। আর একটা বান্ধবীর সাথে বারান্দায় বসে গল্প করছি। যাহোক ওরা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে যখন হয়রান, আমরা আচমকা আবার ওদের হাত থেকে কালির দোয়াত কেড়ে নিয়ে ওদের ওপরই ছিটিয়ে দিলাম। আরও ক্ষেপে গেল ওরা।

যাহোক এ পর্ব শেষ, ক্লাসে যাব। যার জন্য এত উদ্বেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা। রুটিন ও ক্লাসরুম নম্বর আগেই জোগাড় করেছিলাম। কায়েকজন বান্ধবী মিলে রুম নম্বর দেখে ক্লাসে ঢুকতে গেলাম, সেখানে দেখি উঁচু ক্লাসের ক্লাস হচ্ছে, আমাদের ক্লাস না। রুম নম্বর ঠিক অথচ আমাদের ক্লাস না, যখনই ঢুকতে গেলাম সবার সে কী হাসি! সত্যিই বোকা বনে গেলাম। কী ব্যাপার, দেখি সব ক্লাসরুমের নম্বরগুলো কাগজে উল্টোপাল্টা লিখে আমাদের বোকা বানাবার জন্য লাগিয়ে রেখেছে। কাজেই প্রথম দিন ক্লাসরুম নিয়ে ধোঁকা খেয়েই কাটাতে হল। কলেজের প্রথম দিনটা নানা ঘটনায় বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণই হল। যাহোক খুব বেশি ক্লাস আর সেদিন করা হল না। শিক্ষকরা পর্যন্ত ক্লাসরুম নিয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। আর ক্লাস খোঁজার জন্য কলেজটা মোটামুটি ঘুরে দেখা হল। এটাও একটা লাভ হল। জানি না এখনও নতুন ছাত্রীদের এভাবে পুরোনো ছাত্রীরা আপ্যায়ন করে কিনা। আমাদের বড়রা মজা করেছিল।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জীবন অনেক ঘটনাবহুল। আমাদের কলেজে কোনো শহীদ মিনার ছিল না। আমরা দাবি করলাম একটা শহীদ মিনার কলেজের ভিতরেই করতে। কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল কিছুতেই করবেন না। করতে দিবেন না। আমরা আন্দোলন গড়ে তুললাম। আমাদের বাজেট, আমাদের টাকা, আমরা শহীদ মিনার করব। কিন্তু না, তিনি তা দেবেন না। একদিন আমরা কিছু ইট জোগাড় করলাম। অবশ্য কলেজেরই কাজ হচ্ছিল, সেই ইট নিয়ে এসে ইটের ওপর ইট সাজিয়ে একটা শহীদ মিনার বানিয়ে তাতে ফুল দিলাম। এটা ছিল বিশে ফেব্রুয়ারি। পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। কলেজ শেষে সন্ধ্যায় আমরা একুশের সভা করলাম। আমাদের প্রিন্সিপাল খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের মধ্যে নিজে এসে সে মিনার ভেঙে ফেললেন। পরদিন কলেজ বন্ধ। তারপরও খবর পেয়ে গেলাম কলেজে। খালি জায়গায় ফুল দিয়ে এলাম।

তার পরদিন কলেজ খুলেছে, আমরা ঠিক করলাম, ঐ জায়গায়টায়ই আবার ফুল দেব। দেখি একজন একজন করে শিক্ষক বসিয়ে রেখে জায়গা পাহারা দেওয়া হচ্ছে যাতে আমরা ফুল দিতে না পারি। আমরাও কম যাই না, হাতে ফুল লুকিয়ে এক একজন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আর ছুড়ে দিচ্ছি ফুল। সঙ্গে সঙ্গে পাহারারত শিক্ষক তা সরিয়ে ফেলছেন। এ ধরনের লুকোচুরি বেশ চলল।

এক সময় প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে তাঁর রুমে বসিয়ে রাখলেন, অনেকটা বন্দি। বের হতে দেবেন না। তাঁর ভাষায় আমিই নাকি মূল হোতা। পরে অবশ্য মেয়েরা এক হয়ে তাঁর রুমের সামনে যখন স্লোগান দিতে শুরু করেছে, আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য দাবি করছে, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমাদের আন্দোলন বেশ তুঙ্গে। শহীদ মিনার আমাদের চাই। ঢাকার ডিসিকে প্রিন্সিপাল খবর দিলেন। আমাকে হুমকি দিলেন অ্যারেস্ট করবার। আব্বা তখন জেলে, নাজিমুদ্দিন রোড বকশীবাজার থেকে বেশি দূরে না। চার আনা রিকশা ভাড়া লাগে। প্রায় ১৫ দিন পরপর আব্বার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেতাম। কলেজ থেকে প্রায়ই যেতাম। আমাকে যখন হুমকি দেয়া হল গ্রেপ্তারের, বললাম, আপত্তি

নেই। কারণ প্রায়ই তো যাচ্ছি। আর আব্বা যখন ভিতরে আছেনই আমি যাব জেলে। যাহোক ডিসি এলেন। সবাই আমরা ঠিক করলাম, ডিসি যেই বের হবেন, তাঁকে ঘেরাও করব। শহীদ মিনার আমাদের চাই-ই। যে কথা সেই কাজ। গ্রুপ গ্রুপ মেয়ে তৈরি। যেই বের হলেন ডিসি, আমরা ঘেরাও করলাম। আমাদের দাবি মানতেই হবে। আমাদের কলেজের বাজেট থেকেই আমরা করব। কিন্তু করতে দিতে হবে। মেয়েদের দ্বারা ঘেরাও হবে সেটা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি। কাজেই অনেকক্ষণ আটক থেকে কথা দিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করবেন এবং শহীদ মিনার যাতে হয় তা দেখবেন। আমি ভিপি এবং আমার জিএস-এর সঙ্গে আরও দুএকজন প্রতিনিধি যেন তাঁর সাথে এ ব্যাপারে পরে যোগাযোগ করি। তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমরা তাকে ছেড়ে দিলাম। এরপর সময় নির্ধারণের জন্য তাঁর কাছে ফোন করি, আর ফোনও ধরে না, সময়ও দেয় না। আমাদের সাথে ভাল ধোঁকাবাজি দিয়েছে। শেষে একদিন কলেজের মেয়ে নিয়ে জিএসসহ ডিসি অফিসে গেলাম। আমরা কলেজের কথা বলি। তিনি আমাকে আব্বার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোনো পারমিশন লাগলে দেবেন ইত্যাদি কথা বলেন, চা-পানি খাওয়ান। আসল কথা আর বলেন না। যাহোক আমরা ছাড়ি না। অবশেষে বলে এলাম, শহীদ মিনার এ কলেজে হবেই। একদিন করবই। এছাড়া কলেজের অন্যান্য অসুবিধার কথাও এ সুযোগে বলে এলাম। (অবশ্য কলেজে শহীদ মিনার পরে হয়েছে)। তবে আমি ততদিন কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমার পর ছাত্র ইউনিয়ন থেকে কলেজে ভিপি হয়েছিল। মনে আছে বাজেটে সই করিনি, কারণ বাজেটে শহীদ মিনারের বরাদ্দ ছিল না। ৪/৫ ঘন্টা আমাকে সেদিনও বন্দি করে রাখা হয়েছিল প্রিন্সিপালের রুমে। বারবার প্রিন্সিপাল ও অন্য শিক্ষকরা বলায় জিএস আগে সই করল, অবশেষে আমাকেও করতে হল। যাহোক, পরে শহীদ মিনার হয়েছে। আমাদের আন্দোলন বৃথা যায় নি। সেই প্রিন্সিপালকে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে আইয়ুবের পতনের পর বদলি করে অন্য জায়গায় পাঠান হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ-সংসদে ছিল। অবশ্য আমাকে ওরা একবার খবরও দেয় নি, বলেও

নি। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমি এত আন্দোলন করলাম, অথচ সেই শহীদ মিনার তৈরি হল, আমাকে একবার জানাল না। উদারতার এত অভাব, না হীনম্মন্যতা? এই কলেজ থেকে বিপুল ভোটে কলেজ ইউনিয়নে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় রাজনীতি এই কলেজ-জীবন থেকে শুরু। তারপর থেকে আজও চলছে। অনেক স্মৃতিভরা কলেজ-জীবন কত আর লেখা যায়। সময়েরও অভাব। আরও অনেক স্মৃতি ধীরে ধীরে সময় পেলে লিখব। খুব ভাল লাগছে। এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে বলে কিছু কথা বলার সুযোগ হল। কত সুযোগ, বান্ধবীদের সঙ্গে দেখার সুযোগ হবে, শিক্ষকদের সঙ্গে দেখার সুযোগ হবে। আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্মৃতি বড় মধুর। কলেজে আট আনায় এক প্লেট বিরিয়ানি, চার আনায় কাবাব, দুই আনায় পরোটা, দুই আনায় এক কাপ চা, আহ্ স্বাদটা যেন এখনও লেগেই আছে মুখে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরণিকা (১৯৪৮-১৯৯৮)

সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরবগাথায়

আমরা আজ স্বাধীন দেশের বাঙালি। বাঙালি হিসেবে আমরা আত্মপরিচয়ের সুযোগ পেয়েছি। আমাদের পাসপোর্ট আছে। আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারি। কিন্তু এমন দিন আমাদের জীবনে আগে ছিল না। পাকিস্তান নামের যে একটি দেশ তৈরি হয়েছিল, তার ছিল দুটি অংশ, একটি পূর্ব পাকিস্তান অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে কম। কিন্তু ঐ পশ্চিমারা দেশ শাসন করত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অর্থাৎ বাঙালির সংখ্যা বেশি থাকলেও উভয় অঞ্চলেই সমান জনসংখ্যা, এটাই মেনে নিতে বাধ্য ছিল বাঙালিরা। সে সময় বাঙালিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। তার কারণ পশ্চিমাদের সবসময় একটা ভয় ছিল যদি সম জনসংখ্যা না মানা হয়, আর এদিকে যদি অধিক জনসংখ্যা হয় তাহলে হয়ত বাঙালিরাই একদিন পাকিস্তানের ক্ষমতায় চলে যাবে বা ক্ষমতা পেয়ে যাবে। সেজন্য প্যারেটি মানার জন্য চাপ দেয়া হয়েছিল এবং প্যারেটি মেনে বাঙালিদেরকে মাথা নিচু করে চলতে হত। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শুধু শাসনই করেনি নির্দয়ভাবে শোষণও করেছে।

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ করেন। বাঙালি জাতির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে

ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রথম আঘাত হানা হয় ভাষার ওপর। একটি জাতিকে যদি ধ্বংস করা হয় তাহলে তার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং ভাষাকে ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তা করা হয়। বাংলা আমার মাতৃভাষা। সেই বাংলা ভাষাকে বাঙালিরা ব্যবহার করতে পারবে না। 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ ধরনের ঘোষণা দেবার সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালি সোচ্চার হয়। প্রতিবাদে শুরু হয় ছাত্র-জনতার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালে গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়রি ঢাকার রাজপথে গুলি হয়, সালাম-বরকত-জব্বারসহ অনেক শহীদ রক্ত দেয়। বঙ্গবন্ধু তখনো বন্দি। বন্দি থাকা অবস্থায়ও ছাত্রদের সাথে সবসময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বন্দি অবস্থায় হাঙ্গার স্ট্রাইক করেন প্রায় সতেরো দিন। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতি তার ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। নিজ ভাষার মাকে মা বলে ডাকার অধিকার অর্জন করে। বাঙালি জাতিই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যাদের রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ গরিব, অসহায় এবং দরিদ্র। অথচ আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ, যে সম্পদ আমরা কখনও কাজে লাগাতে পারিনি। আমাদের সোনালি আঁশ পাট। পাট থেকেও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সব ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে। নতুন রাজধানী, শহরের পর শহর, নতুন শহর সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে মরুভূমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ বাঙালিরা সবসময় অবহেলিত ছিল। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে এক আপোসহীন সংগ্রাম ছিল তাঁর।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সকলে যৌথভাবে এই যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। এ সময় যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে ২৩৭টি সিটের মধ্যে ২২৩টি সিট যুক্তফ্রন্ট লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। সেই সরকার ছিল জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট

সরকারকেও দেশ চালাতে দেয়া হয়নি। সরকার গঠনের মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে ৯২(ক) ধারা জারি করে সেই সরকার ভেঙে দেয়া হয় এবং জাতির জনকসহ বহু নেতাকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর প্রায় দীর্ঘ ৬ মাস বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন। তারপর তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৬ সালে আবার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন হয়। কিন্তু সেই সরকারকেও টিকতে দেয়া হয়নি।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, যখনই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো সরকার গঠিত হয় তখনই সেই সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। আমরা দেখেছি ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলন হয় কাগমারীতে। যদিও সেই সম্মেলনে কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে আওয়ামী লীগের ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়, আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যান।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে মার্শাল ল’ জারি হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি পান হেভিয়াস করপাস করে। মুক্তি পাবার পর যেহেতু রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল তারপরও তিনি ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন এবং নিজে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। এই বেড়াতে যাওয়াটা ছিল অজুহাত। সংগঠনকে শক্তিশালী করা, গোপনে সংগঠনকে গড়ে তোলা আর বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, সতেচন করা—এটাই ছিল জাতির জনকের উদ্দেশ্য। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে মানুষকে ধীরে ধীরে মার্শাল ল’য়ের বিরুদ্ধে—সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করে সংগঠিত করে তোলার প্রয়াস চালান।

১৯৬২ সালের হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। আরবি অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা বলা

হয়। আমি তখন আজিমপুর স্কুলে পড়তাম। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, শুরু হয় আন্দোলন। আইয়ুব খানের গভর্নর ছিল মোনায়েম খান। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কনভোকেশনে মোনায়েম খানের হাত থেকে কোনো ছাত্র ডিগ্রি নিতে রাজি ছিল না। তাকে সেখানে অপমান করে বের করে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে শেখ ফজলুল হক মনি এবং ছাত্রনেতা আসমত আলী শিকদার — এই দুজনের এমএ ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয় শাস্তি হিসেবে। কারণ ঐ আন্দোলনে আসমত আলী শিকদার এবং শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা। তারা সেই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে তাদের এমএ ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়। যদিও মনি ভাই সবসময়ই বলতেন, 'ডিগ্রি কেড়ে নিতে পারে কিন্তু বিদ্যাতো কেড়ে নিতে পারবে না।' সেদিন ছাত্রদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়, বন্দি করা হয়।

ছাত্র-সমাজ সব সময়ই প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। যেহেতু রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু এই ছাত্র-সমাজই রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আমরাও স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় হাজির হতাম সেই প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৬২ সালে। আমার এখনও মনে আছে, আমি তখন ছোট্ট। সেদিন রাতে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ির একতলায় মাত্র দুটো কামরা করে আমরা উঠেছিলাম তখন। হঠাৎ দেখি চারদিকে পুলিশ। কামাল আর আমি একই ঘরে। আমি কামালকে ডেকে তুললাম যে বাড়িতে পুলিশ, নিশ্চয়ই আব্বাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। ঠিকই কিছুক্ষণ পর পুলিশ আব্বাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ৬ মাস তিনি কারাগারে ছিলেন। এরপর আবার মুক্তি পান। প্রতিবারই আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেতে হয়েছিল।

আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন। মিলিটারি ডিকটেটরদের যে চরিত্র— প্রথমে ক্ষমতা দখল তারপর দল গঠন। দল গঠনের মাধ্যমে দখলকৃত ক্ষমতাকে বৈধকরণের সেই প্রক্রিয়ার

মধ্য দিয়ে মার্শাল ল' প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু এবং অন্য নেতারা মুক্তি পান। ১৯৬৪ সালে আবার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ তারা জানত যে তিনি বসে থাকতে পারেন না। সকল রাজনৈতিক দলের সেই ৯ জন নেতার বিবৃতির কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সে সময় তিনিই সবাইকে সংগঠিত করেন। তিনি যখন এই মিলিটারি ডিকটেটরের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হতে চেষ্টা করেন তখন আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের কথা আজকে যারা প্রবীণ তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এই যুদ্ধে একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান নামে যে অংশ সেই অংশে নিরাপত্তার কিছুই ছিল না। একটা যুদ্ধ করার মত কোনো শক্তি ছিল না। সে সময় বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হত না, যারা বহু কষ্টে নিয়োগ পেত তাদের খুব হেয় চোখে দেখা হত। পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার মত প্রতিরক্ষা খাতে কোনরকম ব্যবস্থা ছিল না। এই অভিজ্ঞতা থেকে জাতির জনক ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে যে সর্বদলীয় মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। সেই ৬ দফা দাবিতে একদিকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতকে আরও শক্তিশালী করা, নেভাল হেড কোয়ার্টার, বাংলাদেশের জন্য পৃথক কারেন্সির ব্যবস্থা, বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করা অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলা হয়। এই ৬ দফার অন্তর্নিহিত ভাষা পাকিস্তানি শাসকবর্গ কখনও পছন্দ করেনি। পছন্দ করেনি বলেই বঙ্গবন্ধু এই ৬ দফা নিয়ে যখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালাতে থাকেন তখন গ্রাম-গঞ্জ-শহরসহ প্রায় সব জেলায় গিয়েছেন। জনগণকে সচেতন করেছেন, ঐক্যবদ্ধ করেছেন। যশোরে গিয়েছেন, মিটিং করেছেন, সেদিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। ময়মনসিংহ গিয়েছেন মিটিং করতে সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। সিলেটে গেছেন মিটিং করতে সেখানেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিনে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এমনিভাবে যেখানে তিনি মিটিং করতে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হত এবং তিনি জামিনে মুক্তি পেতেন। তারপর মে মাসের

৬, ৭, ৮ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং চলে এই ৬ দফার ওপর। ৮ মে বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জে যখন জনসভা করে ফিরে আসেন, সেদিন রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে এই মামলা দেয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে গোপনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করা হয়। আমার মনে আছে আমরা প্রতি ১৫ দিন পর অথবা স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ৭ দিন পর জেল গেটে আব্বার সাথে দেখা করতে যেতাম। যথারীতি আমরা দেখা করতে যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেল গেটে বসে থাকি। কিন্তু সেদিন আর আমাদের দেখা করতে দেয়া হল না। তখন আমরা জানি না কি অবস্থা। তিনি কি বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন? তাঁকে কোথায় নিয়ে গেছে কিছুই আমরা জানতে পারিনি। এরপর দীর্ঘ ৬টি মাস আমরা কোনো খবর পাইনি, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারেনি। ১৯৬৬ সালে তাঁকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৭ জুন ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হয়। সেই হরতালে তেজগাঁওয়ের মনু মিয়াসহ আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের বহু নেতা-কর্মী আত্মাহুতি দেন। জাতির জনকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আন্দোলন এগিয়ে চলে।

আমার বাবা যখন কারান্তরালে বন্দি থাকতেন, তাঁর অবর্তমানে আমার মা পরামর্শ, অর্থ সাহায্য করে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা এবং কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে পর্দার আড়ালে থেকে হাল ধরতেন। ৬ মাস পরে আগরতলা মামলা শুরু হয়। যেদিন মামলার জন্য স্পেশাল কোর্ট বসানো হয় ক্যান্টনমেন্টে। দীর্ঘদিন পর সেই প্রথম আমরা আব্বাকে দেখতে পাই কোর্টে গিয়ে এবং সেদিনই আমরা জানতে পারি যে, তিনি জীবিত আছেন।

আগরতলা মামলায় ৩৪ জন আসামির মধ্যে সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, সিএসপি অফিসার এবং অন্যান্য পেশার লোকদের জড়ানো হয়। এই মামলা চলাকালীন সময়ে আন্দোলনও অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা

কখনই মেনে নিতে পারেনি। এই আগরতলা মামলায় সবচাইতে বড় অভিযোগ ছিল যে, বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ষড়যন্ত্র করছেন।

এরপর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ৬ দফাসহ ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি নিয়ে আমরা তখন ছাত্র সমাজকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলি, সেখানে আমারও একটা ক্ষুদ্র দায়িত্ব ছিল। আগরতলা মামলা যখন চলতে থাকে তখন আমার দায়িত্ব ছিল যোগাযোগ করার, বাইরের খবর বঙ্গবন্ধুকে পৌঁছে দেয়া। সেখান থেকে তিনি যে নির্দেশ দিতেন সেই নির্দেশগুলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমি তখন পালন করি।

আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ষড়যন্ত্র করে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যার পর গণঅভ্যুত্থান হয়, জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলন তীব্র থেকে আরও কঠিন আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে আইয়ুব খান বাধ্য হয় তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে। তবে এর মাঝে আরও কিছু ঘটনা ঘটে। আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু এবং ৩৪ জন আসামিকে যে ফাঁসি দেবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। এ সময় আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করতে চায় এবং প্যারোলে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করার পক্ষে তখন অনেকেই ছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য চিরদিনই যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ৩৪ জন আসামি, তাদেরকে বন্দিদশায় রেখে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে তিনি যেতে কখনও রাজি ছিলেন না। যদিও আমাদের তখনকার দিনের অনেক বড় বড় নেতা এর পক্ষে ছিলেন। আমরা, আমাদের পরিবার এবং আমার মা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। অনেক কথা আমাদের শুনতে হয়েছে। কোনো এক নেতার কাছ থেকে আমাকেও অনেক

কথা শুনতে হয়েছে। আমাদের একজন বলেছিলেন, আমি তার নাম বলতে চাই না, নাম বলাটা সমীচীন হবে না, ইতিহাস কথা বলবে। প্লেন রেডি, অনেক নেতা চলে গেছেন ক্যান্টনমেন্টের যে মেসে আব্বাকে রাখা হয়েছে সেখানে। সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মা খবর পাবার সাথে সাথে আমাকে পাঠালেন যে, তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও, যদি দেখা করতে পার। মা কিছু মেসেজ দিয়েছিলেন সেই মেসেজটা যেন পৌঁছে দেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেতরে যাবার আমার কোনো পারমিশন ছিল না। তবে আমাদের অনেক নেতা, অনেক বড় বড় আইনজীবী, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সেখানে আমি দেখেছি। আব্বাকে বুঝাচ্ছিলেন যে, গাড়িও রেডি, প্লেনও রেডি, গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনেক চেষ্টা করে আব্বার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। আব্বা বেরিয়ে এলেন। গেটের বাইরে আসা তাঁর সম্ভব নয়। তিনি গেটের ভেতরে আমি গেটের বাইরে। শুধু আমি মার ম্যাসেজটা তাঁকে পৌঁছালাম। হাতে একটা চিঠিও ছিল কিন্তু চিঠি দেবার সুযোগ ছিল না। আব্বা বললেন, চিঠি দেবার দরকার নেই, কি ম্যাসেজ বলে যাও। আমি আব্বাকে বললাম, 'মা দেখা করার চেষ্টা করছেন। মার সাথে দেখা না করা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।' আমাদের সেই নেতারা বুঝলেন যে, আমার মা কখনই প্যারোলে যাবার পক্ষে ছিলেন না। আর আমার বাবাতো ছিলেনই না। তাই যারা চাচ্ছিলেন প্যারোলে নিতে তাদের প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হল।

আমি যখন ফিরে এলাম অনেকে আমার সাথে আমাদের বাড়িতে ফিরে এলেন এবং আমার মাকে দোষারোপ করলেন। তারা ভয় দেখাচ্ছিলেন যে, আপনি এত কঠিন, আপনি জানেন না যে ওনাকে ফাঁসি দেবে, ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলবে। আমার মা বলেছিলেন যে, "বিধবা হলে তো আমিই হবো আর পিতা হারালে আমার সন্তানরা হারাবে। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সারা বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তিনি প্যারোলে যেতে পারেন না।" এর পরে এল আমার ওপর আক্রমণ। আমাকে তারা বললেন, তুমি কেমন মেয়ে, তুমি চাও না তোমার বাবা ফিরে আসুক? আমি শুধু

একটা কথাই বলেছিলাম যে, "হ্যাঁ, আমি চাই, আমার বাবা আমার বাবার মতো মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন। আমার বাবা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আপনারা অযথা বাবাকে বিরক্ত করবেন না।" আমি মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন যে, "কিছুই হবে না। তোমার বাবা মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন।"

আমাদের এভাবে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। আমার বাবা সেদিন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে আইয়ুব খান বাধ্য হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং সর্বস্তরে ছাত্র-জনতার আন্দোলন গড়ে তুলে সেই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুবের পতন ঘটে।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তিনি মুক্তি পান। ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ছাত্র-জনসভায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারি করে। মার্শাল ল' জারি করার পরেও ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দেয়। যেটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট, এক মানুষ এক ভোট। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ১৬৯টা সিটের মধ্যে ১৬৭টা সিট আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। যদিও তখন আমাদের অনেক প্রগ্রেসিভ বন্ধুরা 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান দিয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, নির্বাচনটা হোক, জনগণের ম্যান্ডেট নিই। জনগণের ম্যান্ডেটটা হাতে থাকলে পরে তখন কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন করা যায় আমরা দেখব। কিন্তু আগে জনগণের ম্যান্ডেটটা আমরা নিয়ে নিই। কাজেই নির্বাচন হয়। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল সেই মুহূর্তে পাকিস্তানি শাসকরা আর ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি নয়। জাতীয় সংসদ অধিবেশন একবার ডাকা হয়, বাতিল করা হয়, আবার ডাকা হয়, আবার বাতিল করে দেয়া হয়। পহেলা মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে

পড়ে, আন্দোলনে শরিক হয়। গর্জে ওঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু সমস্ত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশে আসেন আলোচনা করার জন্য। একটাই কথা ছিল—৬ দফা। বঙ্গবন্ধুর কথা ছিল যে, ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। আর তাদের কথা ছিল ৬ দফার কিছু ছাড় দিতে। ৬ দফা বাদ দিয়ে শাসনতন্ত্র হবে। এই আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যায়। পহেলা মার্চ ইয়াহিয়ার সংসদ স্থগিত ঘোষণার পরপরই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান সরকার হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বঙ্গবন্ধুর হাতে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি কি চায়, সে কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। মূলত স্বাধীনতার ঘোষণা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কথা জাতির জনক তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে সেদিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দেন। একটা গেরিলা যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি নেবার নির্দেশনা ঐ ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতিকে বঙ্গবন্ধু দিয়ে দেন। বাঙালি জাতি, তখন সকল শ্রেণী সকল পেশার মানুষ যে যেখানে আছে, সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকলকেই এই ভাষণের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। মুক্তি সংগ্রামের এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সারা বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয়। শুধু মেনে নেয়া নয় সেই প্রস্তুতিও তারা গ্রহণ করে। মূলত ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' অর্ডার প্রতিদিন যা জারি হতো বাংলাদেশের জন্য তা সম্পূর্ণ অকার্যকর ছিল। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে যে নির্দেশনা বঙ্গবন্ধু পাঠাতেন, সেই

নির্দেশনা অনুযায়ী গোটা বাংলাদেশের প্রশাসন চলতে শুরু করে। এমনকি কোনো ব্যাংকের টাকা পাকিস্তানে যেত না। সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। ঐ সময়ে লন্ডনের একটা পত্রিকা ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সাথে তুলনা করেছে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাড়ির। ঐ বাড়ি যে ভূমিকা পালন করে ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়িও সেই ভূমিকাই পালন করছে। মূলত বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু পরিচালনা করেন।

২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। আমরা দেখেছি যুদ্ধের সময় বা এ ধরনের কোনো বিপ্লব যখন হয়, স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তখন কতগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়। যারা আক্রমণকারী তারা সাধারণত আন্তর্জাতিক সমর্থন পায় না। বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন কিন্তু কখনো আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চাননি। ঐ সময়টা ছিল মার্চ মাস। এটা একটা প্রচণ্ড স্নায়ুচাপের ব্যাপার। আমরা যখন আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়েছি তখন দেখেছি সঠিক মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কত কঠিন। তখন নানা জনে নানাভাবে কথাও বলে থাকে। কিন্তু ঐ সময় মাথা ঠিক রাখা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া একটা বিরাট ব্যাপার। রীতিমত ঝুঁকি নিতে হয়।

যেই মুহূর্তেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায় সেই মুহূর্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ারলেস ঠিক করা ছিল। বর্তমানে যেমন বিডিআর, তখন ছিল ইপিআর। এছাড়া সমস্ত টেলিগ্রাম অফিস থেকে শুরু করে সব জায়গায় আগে থেকে একটা প্রস্তুতি নেয়া ছিল যে, বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে যে ম্যাসেজ দেবেন সেই ম্যাসেজটা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে হবে। সেই ম্যাসেজ নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে, আমি এখানে সেটা তুলে ধরছি। বঙ্গবন্ধু যে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন, "This may be my last message, From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh Whatever you might be and with what ever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go

on until the last soldier of the Pakistan occupation Army is driven out of the soil of Bangladesh. Final Victory is ours".

ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই ম্যাসেজ চলে যায় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে আমাদের আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে কোথায় ম্যাসেজ যাবে তারাও সেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। পাশাপাশি টেলিগ্রামের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এই ম্যাসেজ ছড়িয়ে দেয়া হয়। এটা বাংলা অনুবাদ করা হয় এবং যে যেভাবে পেরেছে, কেউ হাতে লিখে (তখন তো আর ফ্যাক্স ছিল না, কম্পিউটার ছিল না, কমিউনিকেশন এত সহজ ছিল না) এই ম্যাসেজ সমগ্র বাংলাদেশের সব জাগায় ছড়িয়ে দেয় এবং বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন এই ঘোষণা দেন। এই ম্যাসেজ যাবার সাথে সাথে ৩২ নম্বর বাড়ি আক্রান্ত হয়। আর্মি বাড়ি আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তার করে প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আদমজী স্কুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর যারা সহযোগী, পূর্ব পরিকল্পনা এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাদের করণীয় নির্ধারিত ছিল। কারণ ২৫ মার্চ তারা আক্রমণ করবে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করবে এটা তিনি ভাবেননি, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মত এমন একজন জনপ্রিয় নেতার পক্ষে দেশবাসীকে ছেড়ে কোথাও পালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সকলে যাতে ঠিকমত তাদের শেল্টারে যেতে পারে এবং কি কি করণীয় সেই নির্দেশনা সেই পরিকল্পনা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। বিপ্লবী সরকারের বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। এই বিপ্লবী সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, অনেক ত্যাগ, রক্ত আর মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং নির্যাতনের মাধ্যমে বাঙালিকে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় উত্তাল বাঙালিকে সেদিন রুখতে পারে এমন স্পর্ধা কারও ছিল না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। হয়ত জীবন নয়ত মরণ—তবু স্বাধীনতা, এটাই ছিল বাঙালির একমাত্র সিদ্ধান্ত। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের মিত্রশক্তি এবং

মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

আমরা তখনও বন্দি ছিলাম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৬ তারিখে আত্মসমর্পণ করলেও আমরা সেদিন ধানমণ্ডি ১৮নং রোডের একটি বাসায় বন্দি ছিলাম। ১৭ ডিসেম্বর আমরা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হই।

কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ তখনও জাতির জনক বন্দি। আমরা জানি না তিনি কোথায়। বিশ্বজনমত ও নেতৃবৃন্দের দাবিতে ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি বিজয়ের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। আমরা জাতির জনককে ফিরে পাই। জাতির জনক দেশে ফিরে এসে সরকার গঠন করেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আজ সফল হল। যুগে যুগে বিদেশীরা এসে এদেশ শাসন করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, বাঙালির কর্মস্পৃহা, সংস্কৃতি ও প্রাণশক্তিকে দমন করে তাকে নিরীহ, অসহায় আর দরিদ্র করে রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দূরদর্শীপূর্ণ নেতৃত্ব বাঙালিকে তার স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ করে, সংগঠিত করে এবং এক সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করে। এটাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০১

ভালবাসি মাতৃভাষা

'মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা.....,

আমার ভাষা, মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা।

জন্মেই মাকে মা বলে ডাকি। মায়ের মুখের ভাষা থেকে বলতে শিখি। মনের কথা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করি। যে ভাষায় আমি সব থেকে ভাল বুঝতে পারি সে আমার মায়ের ভাষা। ভালবাসি ভালবাসি মাতৃভাষা ভালবাসি। সকল ভাষার সেরা ভাষা মাতৃভাষা মাতৃভাষা। ভালবাসি মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা আমার ভাষা।

সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মায়ের ভাষাকে ভালবাসে। মায়ের ভাষা দিয়ে সব ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না হৃদয় জুড়ে সবটুকু বলা মায়ের ভাষায়। এর থেকে সুন্দর, এর থেকে মধুর আর কি হতে পারে?

মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে রক্ত দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে।

মা বলে ডাকার অধিকার আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। পারেনি কারণ এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার

জন্য রক্ত ঝরাতে হয়েছে, বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিতে হয়েছে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকব। এ আমার প্রাণের অধিকার। এ আমার অস্তিত্বের অধিকার। আমার জাতিসত্তার অধিকার। ২১শে ফেব্রুয়ারি এমনি একটি রক্তঝরা দিন। ১৯৫২ সালে এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর আরো কত নাম না জানা ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে লিখে গেল ভালবাসি মাতৃভাষা। সেই থেকে তো আমরা মাকে মা বলে পরানভরে ডাকতে পারলাম।

এই বিশাল পৃথিবীর এক কোনে বঙ্গোপসাগরের তীরে ছোট একটি ভূখণ্ডের মানুষ সেদিন কি সাহস দেখিয়েছে। মাতৃভাষাকে ভালবেসে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আত্মত্যাগ করেছে, সে কথা স্মরণ করে প্রতি বছর দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বাংলার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা বংশপরম্পরায়। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, শহীদ স্মৃতি অমর হোক। না, শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি।

এই আত্মত্যাগের শিক্ষা নিয়েই তো ভালবেসেছি দেশকে। লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পেয়েছি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

শহীদের আত্মত্যাগের স্মৃতি আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। বিশ্বসভায় আজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকৃতির জন্যে। আর এ স্বীকৃতি বাঙালিই প্রথম বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিল তার সাহসের কথা। বাঙালিই প্রথম দেখল এ অর্জনের পথ।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু আমাদের একার নয়। সমগ্র বিশ্ব আজ এ দিনটি স্মরণ করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে, স্মরণ করবে এই দিবসের অমর শহীদদের। আবিষ্ট হবে এই দিবসের তাৎপর্য শুনে, শুধুমাত্র মায়ের ভাষাকে বাঁচাতে একটি জাতি কি অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে গর্জে উঠেছিল এক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর যখন ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হবে সকলে অনুপ্রেরণা পাবে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে

বাঙালি জাতি বীরের জাতি, ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ঠিক যেমন রক্ত দিয়েছিল মেহনতী শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য আদায় করতে ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে। আমরা ১ মে শ্রমিক দিবসে আজো তাদের স্মরণ করি।

'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়...।'

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তান নামের দেশটির আবার দুটো খণ্ড। একটা পশ্চিম পাকিস্তান আর একটা পূর্ব পাকিস্তান। দুই ভূখণ্ডের মাঝে দূরত্ব ১২০০ মাইল। প্রায় ১৮৫২ কিলোমিটার। পূর্ব পাকিস্তান নামের অংশটির অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী, মূল ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা।

পাকিস্তান নামের দেশটির এই পূর্ব খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নামে প্রদত্ত বাংলার মানুষ তখন গোটা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগ বাঙালি।

বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবহাওয়া, জলবায়ু ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার জীবনাচরণ সবই আলাদা। শুধুমাত্র একটাই মিল তা হল ধর্ম। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র ধর্মের নামে ১২০০ মাইল দূরের দুটো ভূখণ্ড নিয়ে একটি দেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি বৈষম্যের শিকার হত। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর ছয় মাস পার হবার আগেই শুরু হল ষড়যন্ত্র। করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। করাচির শিক্ষা সম্মেলনের খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর চীপ মিনিষ্টার খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটাই প্রথম

বিক্ষোভ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জিন্নাহর ছবি সরিয়ে ফেলে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) জন্ম হয়। মাতৃভাষার মর্যাদার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বং তমদ্দুন মসলিস নামে অপর সংগঠন একত্রিত হয় মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক ফতোয়া দিলেন যে, উর্দু হল ইসলামের ভাষা আর হিন্দুদের ভাষা হল বাংলা, কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হতে হবে।

অথচ পাকিস্তানে আরো অনেক প্রদেশ রয়েছে, ভাষা রয়েছে। পাঞ্জাব দুই খণ্ডে বিভক্ত, পাকিস্তানে এক অংশ আর ভারতে আরেক অংশ। উভয় খণ্ডে পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ব্যবহার করে।

উর্দু কোনো জাতির মাতৃভাষা নয়। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচসহ আরো অনেক মাতৃভাষা পাকিস্তানে রয়েছে।

আর বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে মাতৃভাষার ওপর চরম আঘাত হানার চেষ্টা বাঙালিরা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকেই যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাই হত রাষ্ট্রভাষা। অথচ যে ভাষায় মাকে মা বলে ডাকি, যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা কেড়ে নেয়ার এক নির্মম ষড়যন্ত্র শুরু হল। এ ষড়যন্ত্র বাঙালিরা কোনোদিনই মেনে নিতে পারে না। মেনে নেবে না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালি বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

মেনে নেবে। বাংলার মানুষ এই ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকারের এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অগ্রণী ভূমিকা নেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ২ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক মুসলিম হলে। এই বৈঠকেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাংলার জনগণকে মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। বিভিন্ন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে।

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহবান করা হয়। বাঙালির বিরুদ্ধে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াবার জন্য এই ধর্মঘট। ১১ মার্চের ধর্মঘটের দিনে ছাত্ররা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ বিক্ষোভে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার যেন আগুনে ঘৃতাহুতি। বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র যখন জানতে পারে ঢাকায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিক্ষোভে তারা রাস্তায় নামে। প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে ১৫ মার্চ বন্দিদের মুসলিম লীগ সরকার মুক্তি দেয়।

জনাব নাজিমুদ্দীন তখন পূর্ব পাকিস্তানের চীপ মিনিষ্টার। তিনি সমঝোতার উদ্যোগ নেন। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করেন ১৫ মার্চ। সংগ্রাম পরিষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় প্রস্তাব পাশ করা হবে যে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। এই ঘোষণার পর সকল ছাত্রবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে এবং পুলিশের হামলার তদন্ত করা হবে। এই সমঝোতায় সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল বন্দি মুক্তি পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা হয় (আমতলা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নতুন এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ে)। ১৬ মার্চের ভাষার দাবিতে যে সভা হয় সে সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সকালে এই সভা শেষ হয়। ঐদিন বিকেলে আইন সভার অধিবেশন বসে। তখন সংসদ ভবন ছিল বর্তমান জগন্নাথ হল যে স্থানে সেইখানে। সেখানে ছাত্ররা জমায়েত হয় কিন্তু সেখানে আবার পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ক্ষেপে যায় জনাব নাজিমুদ্দীনের উপর এবং প্রতিবাদ জানায় এই অত্যাচারের। তারা নাজিমুদ্দীনের তদন্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং পুলিশ নির্যাতনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে।

আমাদের সময়ে সকল আন্দোলনের পীঠস্থান যেমন ছিল বটতলা। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন-সংগ্রাম-মিটিংয়ের জায়গা ছিল আমতলা। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ যেখানে ঠিক সেই স্থানে।

সেই আমতলায় ১৬ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সাথে জনতাও এসে যোগদান করে। পুলিশ সেখানে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বাধার মুখে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস মেরে সভায় হামলা চালায়। সেই হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনে নতুন গতি পায়।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকায় এলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটা তার প্রথম সফর এই ভূখণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। তাকে বলা হত 'কায়েদে আযম' অর্থাৎ পাকিস্তানের জাতির জনক। সেই পাকিস্তানের জাতির জনক পাকিস্তানের এই ভূখণ্ডে এলে তাকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। জিন্নাহকে সম্বর্ধনা

দেবার জন্য তৎকালিন রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক সভা হয়। বিশাল জনসভা, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণ এসেছে কায়েদে আযম অর্থাৎ জাতির পিতাকে দেখতে, তার কথা শুনতে। কিন্তু সেই জনসভায় তিনি ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' আর তখনই ছাত্ররা জনসভার মধ্যেই প্রতিবাদ করল। জনসভায় এই প্রতিবাদ শুনে তিনি একদম চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা বন্ধ করে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলেন নি। এর পর তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু করেন। অবশ্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং বন্দি করে রাখে যতক্ষণ সমাবর্তন শেষ না হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে', এ কথা ইংরেজি ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করার সাথে সাথে সমাবর্তনের উপস্থিত ছাত্ররা নো নো বলে প্রতিবাদ জানায়। ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রইল। ১১ মার্চ এরপর থেকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতে থাকল প্রতিবছর। তার এ ঘোষণায় সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কয়েকজন ছাত্র।

আমাদের সময়ে সকল আন্দোলনের পীঠস্থান যেমন ছিল বটতলা, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন-সংগ্রাম মিটিংয়ের জায়গা ছিল আমতলা। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ যে স্থানে ঠিক সেই স্থানে।

সেই আমতলায় ১৬ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সাথে জনতাও এসে যোগদান করে। পুলিশ সেখানে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বাধার মুখে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস মেরে সভায় হামলা চালায়।

সেই হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনে নতুন গতি পায়। শুধু ঢাকায় নয়, সমগ্র

বাংলাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার জন্য ছাত্রনেতারা জেলায় জেলায় সফর শুরু করে।

১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার জন্য ২৩ জুন গঠন করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী শব্দের অর্থ জনগণ। মুসলিম লীগকে সমাজের উঁচু শ্রেণীর দল হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণের সংগঠন হিসেবে জন্ম নিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরবর্তীতে এই দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার জন্য 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম দেয়া হয়। ভাষার দাবি এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় বঙ্গবন্ধু ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেপ্তার হন। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন অর্থনৈতিক সংকট এবং প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান অথচ মুসলিম লীগ সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেশের এই বিরাজমান খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ফলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান।

১১ অক্টোবর নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নুরুল আমীনের পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনকে আরো বেগবান করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে বলে খাদ্যের দাবিতে আর্মানীটোলা ময়দানে জনসভা ও ভুখা মিছিল বের করে আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই মিছিল থেকে ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। পরে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া

হয়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর ঘাতকের হাতে নিহত হন। খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রপ্রধান হন। পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিক্ষোভ দমাতে পেরে খাজা নাজিমুদ্দিন পুরস্কৃত হন। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫২ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই তিনি ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ ঘোষণায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ করলেন। জেলে তখন বন্দি শেখ মুজিব। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাকে আনা হয় যখন এই ঘোষণা হয়। মেডিকেল কলেজে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করার সুযোগ পান। গভীর রাতে গোপনে মিটিং হয়। আন্দোলনকে জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহিউদ্দিন আহমদ তার সঙ্গী হলেন।

যেহেতু ঢাকায় থাকলে, ছাত্রদের সঙ্গে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান তাই তাকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে হলে স্টিমারে যেতে হত, স্টিমার ছাড়ত নারায়ণগঞ্জ থেকে। নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে অনেক নেতা অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। সেখানেও তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দেন। সকলকে কাজ করার জন্য নেমে পড়তে বলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনশন শুরু করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখানে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রাখার দায়ে বঙ্গবন্ধুকে অনশনরত অবস্থায় ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হল।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর মুসলিম লীগ সরকার গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার লুটিয়ে পড়ল

কালো পীচঢালা পথে। তারা রক্তের অক্ষরে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকার দাবি জানিয়ে গেল। সেই থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবছর 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

আমি ও কামাল খুব ছোট্ট। আব্বা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্দি, তারপরও খুব অসুস্থ অবস্থায় অনশন করছেন। দাদা এ খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে ঢাকায় রওনা হলেন নৌকায় করে। বেশ বড় নৌকায় আমরা দুই ভাইবোন হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। দুইখানা কামরা নৌকায়। টুঙ্গীপাড়া থেকে রওনা হয়ে পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ পাড়ি দিয়ে চারদিনে ঢাকা এসে পৌঁছেছি। তিন মাল্লার নৌকা তাই বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। আজিমপুর কলোনিতে আমার দাদার ছোট ভাই থাকতেন তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আমরা সেখানে উঠলাম। ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমি তখন ঢাকায় ছিলাম, তবে এত ছোট্ট ছিলাম যে, সব স্মৃতি এখন মনে নেই। রাতে কার্ফু, সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডেকেছে। আজিমপুর কলোনিতে এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে কেউ যাতে অফিসে না যায় তার জন্য আহবান করত, আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে ধাওয়া করত। ঘরের ভেতর এক রকম বন্দি থাকতে হয়েছে। পরের দিন আব্বার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে গেছে। দাদা স্টিমারে মা, দাদী, কামাল ও আমাকে দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আর দাদা গেলেন ফরিদপুরে। আব্বাকে ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে মুক্তি দেয়া হল। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দাদা আব্বাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। দীর্ঘদিন অনশনে থেকে শরীরের যে ক্ষতি হয়েছিল তা সারিয়ে তুলতে তিন মাস সময় লেগেছিল। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ঢাকায় আসেন।

১৯৪৮ সাল থেকে যে আন্দোলন শুরু ১৯৫২ সালে এসে সেই আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অবদানই সব থেকে বেশি। প্রগতিশীল ছাত্র সমাজও এ আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখে। আজ যদি বাংলার মানুষের ভাষার আন্দোলন না হত আমরা মাতৃভাষায় কতা বলতে পারতাম না।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করে জয়ী হয়। ১৯৫৫ সালে নতুন কেন্দ্রীয় আইন সভা গঠিত হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের ১২ সদস্য নতুন শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করার জন্য সংসদে সংগ্রাম শুরু করে এবং চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন জয়ী হলেও বার বার ষড়যন্ত্র হতে থাকে এবং স্থায়ী সরকার গঠন হতে পারে না, ভাঙাগড়ার খেলা চলতেই থাকে। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হন। শেখ মুজিব তখন মন্ত্রী হন।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। এবং ঐদিন সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয় এ দিবসটিকে। সেই থেকে আজও ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে বাংলার মানুষ পালন করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকল্প গ্রহণ করে বাজেটে টাকা ধার্য করে। শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বাংলার মানুষের কপালে কোন সুখ স্থায়ী হয় না।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মার্শাল' জারি হয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয় এবং নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। শহীদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন বাতিল করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। আবার দীর্ঘ আন্দোলন ৬ দফা, ১১ দফা, ১৯৭০ নির্বাচন, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন, স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা লাভ সবই রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েয়ে। তারপরও কি ষড়যন্ত্র থেমে থেকেছে? ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারী শহীদ দিবস পালন করে।

১৯৭৫ সালে ঘাতকের দল জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা, সামরিক শাসন জারি, একটার পর একটা সামরিক ক্যু, রক্তপাত, ভোটের অধিকার হরণ, গণতন্ত্র নির্বাসন।

আবার সংগ্রাম, আন্দোলন, রক্তদান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগের বিজয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

মহান ভাষা আন্দোলনে যে অবদান বাঙালি জাতি রেখেছিল তা আজ সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এ আমাদের গৌরবের অহঙ্কারের দিন। এদিন হৃদয়ে ঝরে রক্তক্ষরণের বেদনা, চোকে ভাসে অশ্রু ধরা। মুখে আমাদের গর্বের হাসি। এ এক অদ্ভুত আনন্দ বেদনা আর গর্বে ভরা বিচিত্র অনুভূতি যে অনুভূতি শুধু বাংলার সীমানায় আবদ্ধ নয় আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত।

২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মহৎ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে কত আত্মত্যাগ। অনেক অত্যাচার নির্যাতন স্বীকার করে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভাষার মর্যাদা। আর এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পেয়েছি স্বাধীনতা।

কানাডায় প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি এবং কিছু বিদেশী মিলে মাতৃভাষার প্রেমিক গোষ্ঠী নামে একটি সংগঠন করে। এই সংগঠন প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব পাঠায়। চিঠির উত্তরে মহাসচিব জানান, কোনো প্রতিষ্ঠান নয় জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত কোনো দেশের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে তারা বিবেচনা করতে পারে।

কানাডা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমাকে ফোনে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি জানান এবং প্রস্তাব পাঠাতে পারি কি-না তা জানতে চান। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাঠাতে বলি। প্রস্তাবে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ছিল প্রস্তাব পাঠাবার শেষ দিন। কাজেই অতি দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ করে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকরা শ্রমের মূল্য আদায়ের জন্য জীবন দান করেছিল। সারাবিশ্ব সে দিবসটি পালন করে। শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কথাও বলি। ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদস্যপদ প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক যাই। জাতিসংঘ রজত জয়ন্তী উদযাপন করি। জাতিসংঘের মহাসচিব এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধানদের সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং মহাসচিবের দেয়া মধ্যাহ্ন ভোজে শরিক হই।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জাতির অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরি। মাতৃভাষাকে আমরা কত ভালবাসি তা গর্বভরে উল্লেখ করি।

নিউইয়র্ক থেকে আমি প্যারিস যাই ইউনেস্কো কর্তৃক শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য। ২৪ সেপ্টেম্বর আমাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইউনেস্কোর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিষয়ে আলোচনা করি। ২১ ফেব্রুয়ারির কথাও উল্লেখ করি।

ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতিভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তারা এবং প্যারিসের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৭ নভেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি। ছয় হাজারের বেশি মাতৃভাষা রয়েছে। সঠিক সংখ্যাটি এখনো জানা যায়নি। অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার খোঁজে মানুষ তার সুবিধামতো অবস্থান নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। ফলে সহজে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে নেয়। আর তাই হারিয়ে যায় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা হওয়াতে আর মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে না, অন্তত অস্তিত্ব খুঁজে বের করা যাবে। সংরক্ষণ করা হবে, গবেষণা করা হবে।

বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ছেলেমেয়েদের নিজের ভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইংরেজি অবশ্যই শিখবে, ইংরেজি ও আরবি এই দুটো ভাষা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য এ দুটো ভাষার প্রয়োগ জানতে হবে। পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে পারি কিন্তু তা অবশ্যই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা, বনানীতে ইদানীং দেখা যায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। বাংলা শিক্ষা একেবারেই দেয়া হয় না। প্রতিটি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হব। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় আমাকে খুবই পীড়া দেয়। সেটা হল ইংরেজি একসেন্টে বাংলা বলা।

অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। আর যদি হঠাৎ পয়সাওয়ালা হয় তা হলে তো কথাই নেই। মনে হয় বাংলা বলতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে।

এ প্রবণতা কেন? নিজেদের দৈন্যতা ঢাকার জন্য? না কি যেখানে মৌলিকত্বের অভাব সেখানে শূন্যতা ঢাকার প্রচেষ্টা? অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষ করে পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিদেশে বসবাসরত পরিবারগুলো ঘরে বসে বাচ্চাদের সাথে ইংরেজি বলেন। ফলে বাচ্চাদের মাতৃভাষা শেখার আর কোনো সুযোগই থাকে

না। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা স্কুলে কাটায়। কাজেই যে দেশে থাকে বা যে ভাষায় শিক্ষা নেয় সে ভাষা সহজেই নেয়। ঘরে এসে যদি মাতৃভাষায় কথা না বলা হয় তাহলে তো মাতৃভাষা শিখবেই না।

বাচ্চাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাদের শিখিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষা ব্যবহার করাই প্রয়োজন। বাচ্চারা ভাষা খুবই তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। এমনকি একই সঙ্গে অনেকগুলো ভাষা তারা শিখে ফেলে। ওদের কিন্তু তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত ভাষাভাষী রয়েছে বাঙালি জনসংখ্যার দিক দিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের ভাষা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। আমাদের ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করব। এই গবেষণা কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংগ্রহ করা হবে। মাতৃভাষা উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হবে। বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পৃথিবীর (১৮৮) একশত অষ্টাশিটা দেশ এখন থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করবে। এই দিবস পালনকালে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ আজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমাদের সকলের দায়িত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করা। ২০২০ সালের বাংলাদেশ শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানগরিমায় উন্নত হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে আমাদের ভাষাকে বিকশিত করার জন্য, চর্চা করার জন্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে যত সুন্দর সহজভাবে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় কি তা আমরা বুঝতে পারি? শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষাও শিখতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ছোট হয়ে আসছে বিশ্ব; তাই মানুষে মানুষে যোগাযোগও বেড়েছে। জীবন-জীবিকার অন্বেষণে মানুষ ছুটে যাচ্ছে দেশে বিদেশে। তাই মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি, তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তা মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। রক্তে কেনা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষার চর্চার জন্য আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে। বিশ্বস্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। যে মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পেয়েছে সে মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণ করি সকল শহীদের। শ্রদ্ধা জানাই তাদের প্রতি। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না আজ তা প্রমাণিত। অনেক রক্ত দিয়ে আমরা মহৎ অর্জন করেছি। আজ দল মত নির্বিশেষে সকলের দায়িত্ব এ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা।

হরতাল করব, হরতাল করব না

হরতাল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যেকোন ইস্যুতে বেকায়দায় ফেলার একটা যুৎসই হাতিয়ার। আমাদের দেশে আন্দোলন সংগ্রামে হরতাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে নব্বইয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এই হরতাল ব্যবহার হয়েছিল। আবার পঁচানব্বই ও ছিয়ানব্বই সালেও এই হরতাল ব্যবহার হয়েছিল। ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসেই প্রায় হরতাল পালিত হয়েছে।

বিএনপি-জামাতসহ চারদলীয় জোট বোমা মেরেছে, রিক্সাওয়ালাদের হত্যা করেছে, অফিসগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হত্যা করেছে, বাসের যাত্রীদের হত্যা করেছে, পুলিশের ওপর বোমা চার্জ করে হত্যা করেছে। এমনই অবস্থায় আমি আহ্বান করেছি বিরোধী দলকে বোমা মেরে মানুষ হত্যা না করতে। চারদলীয় জোট বিশেষ করে বিএনপির সব সময় একটা ধারণা যে, লাশ ফেললেই ঘটনা ঘটে যাবে। তাই তাদের নজর ছিল লাশ ফেলার দিকে।

১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনমূলক ভোট কারচুপির নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সংঘটিত আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ জনতার মঞ্চে এসে একাত্মতা ঘোষণা করে। বিএনপি সরকারের পতন ঘটে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়ে সরকার গঠন করি।

আমি বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাই আমরা আর হরতাল করব না, আপনারাও আসুন আর হরতাল নয় একযোগে কাজ করি। কিন্তু বিএনপি এ নির্বাচন মানতে রাজি হয় না। সংসদে প্রথম অধিবেশন শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওয়াক আউট করে তিন মাসের মধ্যে সরকার উৎখাতের হুমকি ও আলটিমেটাম দেয়।

আমরা নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপরিচালনার প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। সব ভুলে সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা চালাই। এমনকি যে সব সরকারি কর্মকর্তা জনতার মঞ্চে যায়নি বা জনতার মঞ্চ নিয়ে তখন ব্যঙ্গ করেছিল এবং আমাদের জানা ছিল তারা কারা, তাদের বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেনি। আমাদের সম্পর্কে নানা কটূক্তি কারা করেছিল তাদের কথাও জানা ছিল তবুও তাদেরও আমরা বুঝতে দেইনি বরং কে কত কাজের লোক সে হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করেছি।

আমাদের ইচ্ছা ছিল দেশটায় অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক অশান্তি হয়েছে, ১৯৭৫ সালের পর থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থানই ঘটেছে ২১ বার। আর এতে প্রাণহানি ঘটেছে, অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। আর হানাহানি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনই আমাদের লক্ষ্য; তাই উইচ হান্টিং না করে ভিন্নমত ভিন্নপথ থাকা সত্ত্বেও সকলকে নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাব।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হল যে, সে কথা কে কানে নেয়? একটার পর একটা হরতাল, জনসভা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পর্যন্ত বোমা, সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা, সরকারকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখা, খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, লুটপাট, মজুদ রেখে হঠাৎ জিনিসের দামবৃদ্ধি এহেন এমন কোনো অপকর্ম নেই যে চারদলীয় জোট করেনি শুধু সরকার পতনের জন্য।

আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলাম। জনগণের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলেই জনগণের কাছ থেকে চারদলীয় জোট তেমন সাড়া পায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সঙ্গে এমন কোনো প্রতারণা করেনি যে জনগণ অবিশ্বাস করবে। আর তাই চারদলীয় জোট আন্দোলনে জনগণের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি। বরং তাদের হঠকারী প্রতারণামূলক আন্দোলনকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৯৯৬ সালের মত করে জনতার মঞ্চ গড়ে তুলবে ঘোষণা দিয়েও তারা করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের আন্দোলনের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না। আন্দোলনে জনগণের সাড়া তারা পায়নি। অত্যন্ত কঠিন সঙ্কটের মধ্য দিয়েই আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা করতে হয়েছে।

২০০১ সালের নির্বাচনেও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। একক দল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের ভোট আওয়ামী লীগই পেয়েছে।

নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ হত, ফলাফল ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত পরিকল্পিত বহুমুখী কারচুপির খেলা না হত, তাহলে জনগণের রায় অনুযায়ী আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করত। কিন্তু গভীর চক্রান্ত ও নীল নক্সা করে জনগণের দেয়া ভোটের ম্যান্ডেট পাল্টে দেয়া হয়। একটা হিসাব কিছুতেই মেলে না যে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভোট কারচুপি করেও চারদলীয় জোট পায় ৪৬ ভাগ ভোট অর্থাৎ ২ কোটি ৫৮ লাখের কিছু বেশি। আর এদিকে আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে পায় ৪১ ভাগ অর্থাৎ ২ কোটি ২৮ লাখেরও বেশি ভোট। এর সঙ্গে যেখানে আওয়ামী লীগের একের অধিক প্রার্থী দাঁড়িয়েছে সে সকল ভোট যদি যোগ দেয়া হয় তাহলে ভোট আরও বাড়বে। বহু জায়গায় নৌকার সিল মারা ব্যালট ফেলে দেয়া হয়েছে। এত কিছুর পরও একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বেশি ভোট পায় কিন্তু আসন দেয়া হয় ৬২টি। একদিকে ৪১ ভাগ ভোট আর ৬২

আসন, অন্যদিকে ৪৬ ভাগ ভোট ও ২১৪ আসন। অঙ্কের হিসাবে এটা কিভাবে মিলতে পারে? গাণিতিক হিসাব কি কেউ মিলিয়ে দিতে পারবে যা গ্রহণযোগ্য হবে?

ভোট কারচুপি না প্রকৃতপক্ষে ভোট ডাকাতি করে নির্বাচনে জয়ী হিসেবে নিজেদের দেখিয়ে সরকার গঠন করেছে চারদলীয় জোট। ঠিক আছে ক্ষমতা দখল যখন করা হয়েছে তো ক্ষমতা ভোগ করুক, কিন্তু যে নির্যাতন শুরু করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। কিছু পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ পত্রিকাই জোটের পক্ষের বলে তাদের রক্ষার চেষ্টা দেখেছি। এ ধরনের নির্যাতন যদি আওয়ামী লীগ সরকার করত তাহলে সব পত্রিকার চেহারাই অন্যরকম হত। ১৯৭১ সালের পর এবারই গণহারে নারী নির্যাতন ও মাবোনদের ধর্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাদ পড়েনি। মুসলমান মেয়েরাও ধর্ষিত হয়েছে। এমনকি পোলিং এজেন্ট থাকার দায়ে এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় সাংবাদিকরা পর্যন্ত ভয়ে সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত করতে পারছে না। নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এক ফেনীর টিপু নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখন জেলায় জেলায় টিপু হচ্ছে। মামলা দিয়ে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বলতে বাধ্য হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হয়নি— এই হল নির্যাতনের চিত্র, যার প্রকৃত চিত্র এখন পর্যন্ত কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেনি দুএকটি ছাড়া। তবে বেশ দেরিতে হলেও কিছু কিছু পত্রিকা কিছু সংবাদ পরিবেশন করেছে সরজমিন তদন্ত করে। সেখানেও তদন্ত করে যে বীভৎস চিত্র পেয়েছে তার সবকিছু কি প্রকাশ করতে পেরেছে? পারেনি বা করেনি।

ঘরে ঘরে লাঞ্ছিত মা-বোনদের আহাজারি। বিভিন্ন এলাকায় সফরে গিয়েছি, যে সকল মাবোন প্রকাশ্যে সামাজিক কারণে নির্যাতনের কথা বলতে পারে না, তারা সেখানে আমাকে তাদের নির্যাতনের কথা বলেছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর এর প্রতিবাদ না করে

কিভাবে পারব? হরতাল করব না, আমার এই ঘোষণাটা বড় না এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করাটা বড়? বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল, মিটিং সবই করা হয়েছে কিন্তু চার দলীয় জোট কি তাতে নির্যাতন বন্ধ করেছে? সন্ত্রাসীদের বিচার করেছে? না-কি সন্ত্রাসীদের আরও দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়েছে? এই বীভৎস ঘটনা যখন সরজমিন দেখতে গিয়েছি তখন নির্যাতিতরাই দাবি করেছে, "আপা আন্দোলন করেন, হরতাল ডাকেন, কিছু একটা করেন, আমরা তো আর বাঁচতে পারি না।"

হাত পার রগ কেটে দিয়েছে, চক্ষু তুলে ফেলেছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, এমনকি হাতের দশটা আঙ্গুল কেটে নিয়েছে। কারো দুহাত কেটে দিয়েছে, যাতে জীবনে আর চলাফেরা বা কাজ করে খেতে না পারে।

মায়ের কোল থেকে শিশু কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে পা দিয়ে শিশুকে মাড়িয়েছে। হাত পা হাড্ডি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কেউ বেঁচে গেছে কেউ সেখানেই মরে গেছে, তারপর মাকে ধর্ষণ করেছে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিবাদ জানাব, কিভাবে তাদের পাশে দাঁড়াব? ঘোষণা দিয়েছি হরতাল করব না, তাই বলে কি চুপ করে থাকব?

কোথাওবা ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে, আবার কোথাও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে ঘরবাড়িসহ। ভিটেমাটি কেটে পুকুর বানিয়ে পুকুর পাড়ে কলাগাছও পুঁতে দিয়েছে। নিজ গ্রামে আর বসবাস করার সুযোগ নেই। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়। কত ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে, কত জনের জীবন-জীবিকার পথ বন্ধ হয়েছে। পাকা দালান যাদের তাও আবার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, মুরগির ফার্ম, পুকুরের মাছ, মাছের ঘের, গরু, ছাগল লুটপাট করেছে। প্রকাশ্যে লুট করে গরু জবাই করে খেয়েছে। এমনকি ক্ষেতের পাকা ধান পর্যন্ত কেটে নিয়ে গেছে। হাজার হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে, তাদের অপরাধ তারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে।

ভোটের অধিকার তো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। আর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, তা প্রয়োগ করতে গিয়ে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এই নির্যাতিত মানুষের কান্না কি সমাজের বিবেকবান মানুষরা শুনতে পান না? তাদের মুক্তির পথ কি? তারা যদি আমার কাছে দাবি করে আপা কিছু করেন, আন্দোলন করেন, হরতাল দেন, আমাদের বাঁচান সেখানে আমার ঘোষণা বড় না তাদের বাঁচার পথ খোঁজা বড়?

চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর আমরা তো ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেছি, অথচ এরা তো আমাকেও হত্যার হুমকি দিয়েছে। ইন্নালিল্লাহ পড়েছে পল্টনের মিটিংয়ে । আর একটা ১৫ আগস্ট ঘটাবে বলেও হুমকি দিয়েছে। এরপরও মানুষের পাশে থেকেছি, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে ঘোষণার কথা ভেবে চুপ করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া আর মানুষকে নিগৃহীত হতে দেয়াটা কি ন্যায় কাজ?

আমি যখন ঘোষণা দিয়েছি হরতাল করব না, তখন অন্য কোনো দল তো ঘোষণা দেয়নি। দেশের কথা চিন্তা করে আর কোনো নেতাও তো বলেনি। এমনকি আমাকে সমর্থন পর্যন্ত করেনি। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সকলের মন্তব্যের সাথে তো কেবল আমিই একমত পোষণ করেছি কিন্তু তারা তখন কেন পারল না অন্যকেও সেই মতে নিয়ে আসতে? যা সকল দল মানবে না তা শুধু আমাদের দলকে মানতে হবে এটা কোন যুক্তি। আমিতো ভেবেছিলাম আমার ঘোষণার সাথে সাথে যারা হরতাল চায় না তারা অন্যের কাছ থেকেও ঘোষণা আদায় করতে সক্ষম হবেন। তাদের আমি সেই সুযোগই করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা কি তারা করতে পেরেছেন? পারেননি।

আমি রাজনীতি করি মানুষের জন্য। মানুষের কষ্ট-দুঃখ আমি বুঝি। তাই পাঁচটা বছর আমাদের দেশের গরিব-দুঃখী খেটে খাওয়া মানুষের দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা, একটু মাথা গোঁজার ব্যবস্থা

করার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, সফলও হয়েছি। অর্থনৈতিক মুক্তির পথের ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে এসেছি। পরবর্তী সরকার যদি সঠিকভাবে এ পথে কাজ করে অবশ্যই আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কোনো মানুষ হতদরিদ্র থাকবে না, সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু এখন যে লক্ষণ দেখছি তাতে মানুষের জীবন বাঁচানোই তো দায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় মানুষের পাশে কি দাঁড়াতেও পারব না? অন্যায়ের প্রতিবাদও করব না? একের পর এক অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার হতে থাকবে, আর চুপ করে দেখে যাব? মানুষের বিবেক বলেও তো একটা কথা আছে। যে মানুষের জন্য রাজনীতি করি সেই মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতন হলে তা প্রতিবাদের যত প্রকার ভাষা আছে, সবই প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্যই আমরা এটাও দেখব যে, তা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ যেন কষ্টে না পড়ে। মানুষের কল্যাণের জন্যই তো আমার রাজনীতি। এই অন্যায় অত্যাচার অবিচার যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষের কাছে আমার আহ্বান থাকবে, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন। বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চা করব আর একটি দলের সমর্থক তার নিজ এলাকায় থাকতে পারবে না, এটা কেমন কথা? চাকরিজীবী তা তিনি সিভিল প্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, বিড়িআরসহ সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত যেখানেই হোন, বাবা, দাদা, ভাই, শ্বশুর-শাশুড়িসহ যে কোনভাবে কোথাও আত্মীয়তার ছোঁয়া থাকলেই তাকে চাকরি থেকে বের করে দিতে হবে, অপমান করতে হবে, এটা কি ধরনের গণতন্ত্র? চারদলীয় জোটের নামে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে অন্য দলের অস্তিত্বও থাকতে দেয়া হবে না? উইচ হান্টিং চলছে সর্বক্ষেত্রে। নিম্নপর্যায়ের কর্মচারী থেকে অফিসার পর্যন্ত যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই চাকরি থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করে এককভাবে যুগ যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকাই এখন তাদের যেন উদ্দেশ্য! জনগণের মতামতের কোনো মূল্য নেই। মত প্রকাশের

কোনো স্বাধীনতা থাকবে না? মানবাধিকার আজ লজ্জিত। এই যখন দেশের সার্বিক অবস্থা তখন কি আমি ঘোষণা দিয়েছি তা নিয়ে বসে বসে মানুষের কষ্ট দেখব না কি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেব?

যারা আন্দোলন চান না তারা সরকারকে বাধ্য করেন উইচ হান্টিং বন্ধ করতে। শত শত নিরাপরাধ কর্মকর্তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কার বন্ধ করুন। শত শত লাঞ্ছিত মা-বোনের যারা গণধর্ষণ করেছে, গণহত্যা যারা চালিয়েছে, চাঁদাবাজি, দখলদারি, ঘরবাড়ি জ্বালাও-পোড়াও যারা করেছে তাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। নির্যাতন অত্যাচার বন্ধ করুন। ঘরবাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট চাঁদাবাজি সন্ত্রাসীর হাত থেকে মুক্ত করুন— হরতাল করার প্রয়োজন হবে না।

আর যদি এসব বন্ধ না হয় তাহলে মানুষকে অন্যায় অবিচারের হাত খেকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য যেকোন ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব। যার জন্য যে ভাষা বোধগম্য তার ক্ষেত্রে সেটাই প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অন্তত দেশ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য।

২.১২.০১

বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে (ক) বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

এক

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যেভাবে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে খেলা হল, ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল, নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করার অপরাধে শাস্তি দেয়া হল তাতে আর যাই হোক গণতন্ত্র বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। বরং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা হোঁচট খেল চরমভাবে। "আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব"—এই স্লোগান গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের ভোটের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ভোট দানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনা এবং সর্বোপরি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত জাতীয়

সংসদে উত্থাপিত বিভিন্ন এলাকার সমস্যাবলী ও তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি, আস্থা ও বিশ্বাসকে জাতীয় সংসদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। মানুষও গভীর মনোযোগ দিয়ে সংসদের কথা রেডিওর মাধ্যমে শুনত। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই রেডিওর মাধ্যমে সংসদ কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম সংসদ সম্পর্কে গণ-মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য। ভোটের অধিকার অর্থাৎ গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্য, অনেকটা সফল হয়েছিলাম। মানুষের মাঝে আস্থা বিশ্বাস ফিরে এসেছিল। কিন্তু ১ অক্টোবরের নির্বাচন সবকিছুকে ধ্বংস করে দিল। মানুষ চরম একটা আঘাত পেল যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি পুনঃনির্বাচন ও উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার কি হারে হ্রাস পেয়েছে তা দেখে। যদিও ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্স ভরে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যা ছিল এক তরফের নির্বাচন কিন্তু মানুষের আগ্রহ ছিল না ভোট প্রদানের। আমার দুঃখটা এখানেই, যে গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন করলাম, শত শত মানুষ রক্ত দিল, গণতন্ত্র মুক্তি পেল, আজ আবার সেই গণতন্ত্র, কালো টাকা, পেশি শক্তি ও বিদেশী বেনিয়া এবং তাদের দেশী এজেন্ট অর্থাৎ বাংলার দালালদের হাতে বন্দি হয়ে গেল।

এমনি এক গ্যাস কোম্পানির এদেশীয় দালাল নাকি বলেছে যে, নির্বাচনে হারিয়েছে এখন যদি বেশি বাড়াবাড়ি করি তাহলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল এখন আমাকেও সেভাবে শেষ করে দেবে। যেভাবে নেপালে রাজপরিবারের সকল সদস্য নিহত হয়েছে সেভাবেই ঘটনা ঘটবে ইত্যাদি।

দুই

কি কি কারণে এই ষড়যন্ত্র?

গরিবের ঘরে সুন্দরী বউ থাকলে সকলের ভাবী হয়। গ্রাম বাংলার ভাষায় বলে, “গরিবের সুন্দরী বউ থাকলের ভাউজ”।

তখন নানান ধরনের মতলবের মানুষ সেই ঘরে ঘুর ঘুর করে। ফলে ঘর সংসার টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ সংসারে আর শান্তি থাকে না।

ঠিক এমন দশা হয়েছে বাংলাদেশের। ৫৪ হাজার বর্গমাইলের এই দেশে তের কোটি মানুষের বাস। জীবন ধারণের জন্য সম্পদের রয়েছে সীমাবদ্ধতা। আছে সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস। গ্যাস যেখানে থাকে সেখানে তেল থাকারও সম্ভাবনা থাকে। তাও কত আছে কত বছর চলবে তার কোনো হিসাব নেই। গ্যাস সুবিধা কত ভাগ মানুষ পাচ্ছে? দেশের ৯২ ভাগ মানুষতো এখনও পুরোপুরি এ সুবিধা ভোগ করতেই পারেনি। মাত্র ৩/৪ ভাগ মানুষ ব্যবহারিক কাজে সরাসরি সুবিধা পাচ্ছে। কাজেই এই সম্পদটুকু হরণ করার হীন চক্রান্ত কেন? দেশের মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র কেন?

এই সামান্য সম্পদই কি মানুষের জন্য 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়? আর আমার অপরাধ? কেন সত্য কথা বললাম? কেন ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম না, "ক্ষমতা চাই, গ্যাস তেল সব নিয়ে যাও শুধু আমাকে মসনদে বসাও।" গোপনে সব সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দিলাম না। দেশকে ভালবাসাই কি অপরাধ?

তিন

জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার করা কি অপরাধ?

১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর খুনিরা গর্ব করে বলেছিল পারলে কেউ তাদের বিচার করুক। তাদের ধারণা ছিল এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটে কিন্তু তার বিচার কোনদিন হয় না। আর তারা তো এই পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান অর্থাৎ দশ বছরের রাসেলকেও হত্যা করেছে যাতে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি কোনো অবলম্বন না পায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে।

যে খুনিরা গর্ব করে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছিল, ঘোষণা দিয়েছিল তারাই হত্যা করেছে —- সেই খুনিদের বিচার হয়েছে। বিচারের রায়ে তাদের ফাঁসি হয়েছে, সে রায় এখন আপিল বিভাগে চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় আছে। পৃথিবীতে এরকম অনেক ঘটনা ঘটিয়ে অনেক সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে কিন্তু কখনও খুনিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। ফাঁসির আদেশ হয়নি। সেখানে বাংলাদেশের মত একটা দেশে খুনিদের প্রচলিত আইনে বিচার হয়েছে, বিচারের রায়ে ফাঁসি হয়েছে। এদেরও বিদেশী আশ্রয়দাতা আছে। এমনি একটি আশ্রয়দাতা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে এই খুনিদের মাফ করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এবং মাফ করে দেয়ার মহত্ত্ব পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াত উল্লেখ করেছিলেন।

আমি উত্তরে কোরআন শরীফের আয়াত উল্লেখ করে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং পিতৃহত্যাকারীদের প্রতি কি আচরণ সন্তাদের করা উচিত, পবিত্র কোরআন শরীফ কি পথনির্দেশ করেছে আমি যে সে পথেই আছি তা উল্লেখ করে উত্তর দেই।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, হত্যাকারী যারা শিশু ও নারীদের রেহাই দেয়নি তাদের বিচার করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই কি আমার অপরাধ?

এই খুনি ও তাদের আশ্রয়দাতা এবং মদদদাতাদের অঢেল টাকা চার দলকে যোগান দেয়া হয়েছে কারণ চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে খুনিদের বিচারের হাত থেকে মুক্তি দেবে। ফাঁসির আদেশ যাতে কার্যকর না হয় সে ব্যবস্থা তারা করে দেবে।

ড্রাগ, অস্ত্র, সোনা চোরাচালানকারীদের একটা অশুভ সংযোগ এই খুনি চক্রে রয়েছে। এই চক্রের অগাধ টাকা এসেছে যা হাওয়া ভবনের কামরায় গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। সেখানে নিরাপত্তা বেষ্টনি এমন উন্নত মানের যে—বাংলাদেশ সরকারেরও এত নিরাপত্তা সরঞ্জাম আছে কি-না সন্দেহ।

চার

'মিলেনিয়াম সামিট' জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত হল সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য। সৌভাগ্য বাংলাদেশের যে এমন একটি সময়ে সদস্য হয়েছে যখন মিলেনিয়াম অর্থাৎ সহস্রাব্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ নির্বাচিত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে। সাধারণত এই পদে প্রতিযোগিতা হয়। পূর্বে আশির দশকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ভোটের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক অবস্থায় পড়েছিল।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বিশ্ববাসীর কাছে।

যেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, খাদ্যে চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন ঘাটতি পূরণ করে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি, সর্বোপরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এক সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অপর দিকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সহযোগিতা করা এবং শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ ও বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর বহনের ফলে বাংলাদেশ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে।

নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন সভায় আন্তর্জাতিক ইস্যু, শান্তি রক্ষা, মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার, সিটিবিটি, এনটিবি, ল্যান্ডমাইন ব্যবহার বিরোধী, পরমাণু বোমা ব্যবহার বিরোধী অর্থাৎ মানবতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশকে শান্তির স্বপক্ষে, মানবতার পক্ষে দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

দারিদ্র্যবিমোচনে ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও তা বাস্তবায়নে সাফল্য সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ একটি মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ

করে। পরবর্তীতে যা বাংলাদেশকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ অর্জনে সহায়তা করে। সহস্রাব্দের সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় বাংলাদেশ বক্তব্য রাখার সুযোগ পায়। এই সম্মেলনের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সকল সদস্য দেশের সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন— যা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন ছাড়া আর এমন ঘটনা ঘটেনি। কাজেই বিশ্বের এই ঐতিহাসিক ঘটনায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এক স্মরণীয় মুহূর্ত। জাতিসংঘ সমগ্র বিশ্বে মানবতা, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, শান্তিরক্ষায় অবদান রাখে।

এই স্মরণীয় সম্মেলনে আমার বক্তৃতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে ও বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরি। নিজের দেশের মানুষের অধিকারের কথা উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র, ভোটের অধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ করি।

সম্মেলনে আমি একটা প্রস্তাব রাখি—সে প্রস্তাবটি হল কমনওয়েলথ যেভাবে প্রস্তাব নিয়েছে কোনো সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে সে সরকারকে সামরিক শাসক উৎখাত করলে কমনওয়েলথ স্বীকৃতি দেবে না কাজেই জাতিসংঘেরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং অনুরূপ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দেই। আমি আমার প্রস্তাবটা খুবই সাধারণ প্রস্তাব হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। কোনো নির্দিষ্ট দেশকে বা দেশের নাম উল্লেখ করিনি। কিন্তু পাকিস্তান এই বক্তৃতায় খুবই নাখোশ হয়। এতই নাখোশ হয় যে— পাকিস্তানের চিফ এক্সিকিউটিভ জেনারেল পারভেজ মোশাররফ আমার সঙ্গে নির্দিষ্ট বৈঠকে যোগ দেন না। আমি যখন তার জন্য অপেক্ষা করছি তখন মাত্র পাঁচ মিনিট আগে তারা জানাল যে, ট্রাফিক জ্যাম সে জন্য তাদের চিফ এক্সিকিউটিভ আসতে পারবেন না।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইর অনেক এজেন্ট আমাদের দেশে রয়েছে। ফিরে এসেই তাদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য

হারে বৃদ্ধি হতে দেখলাম। আমার সরকার উৎখাত করার নীলনকশা কার্যক্রম শুরু হল। গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলা কি অপরাধ?

পাঁচ

জাতির সামনে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা, যে অন্যায় অবিচার দেশে রয়েছে সেই অন্যায় অবিচারের কথা বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের কথা, লাখ লাখ মা-বোন যারা লাঞ্ছিত তাদের কথা তুলে ধরা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, রাজাকারদের অন্যায় অবিচার অত্যাচারের কাহিনী জাতির সামনে তুলে ধরা, প্রকৃত ইতিহাস মানুষের কাছে উপস্থাপন করা, এটা কি অন্যায়? এরা প্রাক্তন প্রভু। যাদেরকে যুদ্ধ করে বাংলার দামাল ছেলেরা পরাজিত করেছিল তাদের কথা বলা যাবে না কেন? পরাজিত প্রাক্তন প্রভুরা নাখোশ হন। প্রভুদের পালিত সারমেয়দল অত্যন্ত প্রভুভক্ত, যতই বুটের লাথি খাক, ঝাঁটা খাক গোলামীর বন্ধন তাদের বড় মধুর লাগে। মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ তাদের কাম্য নয়।

মেরেছ কলসির কানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না?

ঠিক এমনি প্রেমে গদগদ প্রভু প্রেমে যারা বিভোর তারা স্বদেশ বেচে দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

আওয়ামী লীগ আমলে তাই ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে কতবার তাদের প্রভুদের নাম টেলিভিশনে নেয়া হয়েছে তা হিসাব কষে অঙ্কের ভাষায় খবর পৌঁছে দিতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি।

কাতারে ডি-৮ সামিটে পাকিস্তানের চিফ এক্সিকিউটিভের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হল তখন একথা তিনি ও তার সঙ্গীরা উল্লেখ করতে ভুললেন না। তাদের আমি বললাম ইতিহাস ইতিহাসই। ইতিহাস তো মুছে ফেলা যাবে না। মুছে ফেলা যায় না। আমি বললাম আমরা ক্ষমা করতে পারি কিন্তু ঘটনাতো ভুলতে পারি না। "We can forgive

but we can not forget." আর ইতিহাস থেকেই তো মানুষ শিক্ষা নেয়। তাই যদি না হত তাহলে সিলেবাসে ইতিহাস থাকে কেন? বাংলাদেশের মানুষের সাথে যা ঘটেছে, তা কি প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানতে পারবে না?

বাংলাদেশের মানুষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে। বিজয়ী হিসেবে বিজয়ের ইতিহাস নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে না? গৌরবের এই ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করে তাদের বিকৃত ইতিহাস শেখাতে হবে. জানাতে হবে? তাহলে তাদের চরিত্র সুদৃঢ় হবে কিভাবে? সত্যকে জানতে পারবে না? মিথ্যা, বিকৃত তথ্য জেনে নতুন প্রজন্ম কি নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলতে পারবে?

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

কবির ভাষায় অর্থাৎ যা ঘটে তা সত্য নয়, কবি যা রচনা করে তাই সত্য? অর্থাৎ ইতিহাস সত্যকে বাদ দিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যা রচনা করা হবে তাই সত্য হয়ে যাবে আর যা সত্য তা কি হারিয়ে যাবে?

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম, নিষ্ঠুর, একদিন না একদিন সত্য প্রকাশ পাবেই। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কত চাপা দেবে? অনেক সত্য বরং পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক, সামরিক কর্মকর্তার কাছ থেকেই বেরিয়ে আসছে— কত দিন বন্ধ করে রাখতে পারবে?

কিন্তু এটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ যে— আওয়ামী লীগ সত্যকে উদঘাটন করেছে। আমাদের দেশের নতুন প্রজন্ম যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে, সত্য জেনেছে, জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে আর কি বন্ধ রাখতে পারবে? পারবে না।

কিন্তু এই সত্য প্রকাশের শাস্তি কি নির্বাচনের ফলাফলে কারচুপি ব্যবস্থা করা?

ছয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি দেশের জন্য যা শুভ ফলদায়ক তার বিরোধিতা করা কেন? একটি যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল যেখানে শান্তিচুক্তির পর সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ড্রাগ চাষ হত, পপি সিড উৎপাদন হত। সেই ক্ষেত ধ্বংস করে সেখানে খাদ্য উৎপাদন শুরু হয়েছে।

আমার প্রশ্ন এই ড্রাগের ক্রেতা কারা ছিল? কোথায় বিক্রি হত? কাদের এত বড় ব্যবসার ক্ষতি করলাম? শান্তিচুক্তি না হলে তো এটা আবিষ্কার হত না।

যুদ্ধাবস্থা থাকলে অস্ত্রের চোরাকারবারি ব্যবসা জমজমাট থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় অস্ত্র চালান আনানেয়ার গোল্ডেন ট্রাঙ্ক রোড সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া যারা গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাদেরও অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তারা অস্ত্র ক্রয় করত। এখন প্রশ্ন কারা সেই ব্যবসায়ী যাদের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় করা হত বা অস্ত্র এলে সরবরাহ করত? তাদের ব্যবসায় তো মন্দা পড়েছে। তাই তারা নাখোশ।

শান্তিচুক্তি কেন করলাম? আর এই চুক্তির ফলে যাদের ব্যবসা নষ্ট হল তারা কি ছেড়ে দেবে? তাইতো এই চুক্তির বিরোধিতা করতে দেখেছি। এমনকি ভারতীয় পতাকা তৈরি করে ভারত হয়ে যাবে কথার প্রমাণ করার প্রয়াসও আমরা দেখেছি। চার দলীয় জোট হরতাল-লংমার্চ আন্দোলন করেছে শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে— তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল শান্তিচুক্তি করায়?

সাত

গঙ্গা পানিচুক্তি

ফারাক্কা লংমার্চ, ভারতবিরোধী জিকির, দেশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে দেশ বাঁচাবার কোনো তাগাদা নেই। গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করার প্রচেষ্টা ছিল না কিন্তু ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা আর তা করতে গিয়ে যে দেশের সর্বনাশ

সে দিকে কোনো নজর ছিল না। উত্তরবঙ্গ শুষ্ক মরুময় হয়ে যাচ্ছিল। গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গড়াই নদী শুকিয়ে গিয়েছিল, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ফসল নষ্ট হচ্ছিল, লবণাক্ত এলাকা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুন্দরবনে গাছ, হোগলা বন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। প্রজনন ক্ষেত্র কমে যাচ্ছিল। পানিচুক্তির ফলে দেশ মরুময়তা থেকে এবং দক্ষিণাঞ্চল লবণাক্ততা থেকে রক্ষা পায়। জি. কে প্রজেক্ট চালু হয়েছে। সেচ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটিতে রস এসেছে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্যামল সবুজ বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাটাও কি একটা অপরাধ?

বিদেশী সাহায্য যাদের জন্য লাভবান তাদের কাছে তো বটেই। তবে আমরা কৃষিতে যে ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছি তাকে যদি দক্ষতার সাথে পরিচালন করা যায় বাংলাদেশে কোনদিন খাদ্য ঘাটতি হবে না ইনশাল্লাহ। শ্যামল সবুজে ভরে উঠেছে বাংলাদেশ এও কি সহ্য হয় না তাদের? গঙ্গার পানিচুক্তির ফলে ভারতবিরোধী একটা ইস্যু হাতছাড়া হয়ে গেল যাদের তারা কতটা নাখোশ আমার ওপর তা তো পাঠক সমাজ বুঝতে পারেন। এর প্রতিশোধ নিতে হবে না? দেশের মানুষ উপকার পেলে কি হবে বিশেষ গোষ্ঠীর তো রাজনৈতিক ক্ষতি।

"খাদ্য ঘাটতি থাকা ভাল বিদেশী সাহায্য পাওয়া যায়।"

এ উক্তি বিএনপি নেতা বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের। অর্থাৎ দেশকে সবসময় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে চলতে হবে। আত্মমর্যাদাশীল হওয়া যাবে না।

বিএনপি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

বিএনপি সরকারের সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণের ফলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হত্যা-খুন প্রতিদিনের ঘটনা। তার ওপর উপ-নির্বাচন ও ঢাকার মেয়র নির্বাচনে কারচুপি এবং সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড ঘটে। মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তোলে। বিএনপি সরকারের দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু

জনগণের সে দাবি উপেক্ষা করে ১৯৯৫ সালে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন দেয় বিএনপি।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করে, জনরোষের মুখে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের পতন ঘটে।

কি রেখে গিয়েছিল তারা—চল্লিশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি। বিধ্বস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতি।

তাহলে তাদের নীতিই হল দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকবে। এই চল্লিশ লাখ মেঃ টন খাদ্য ঘাটতি থাকার অর্থ হল দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা।

আমার প্রশ্ন হল এই খাদ্য ঘাটতি দেখিয়ে তো বিদেশ থেকে তারা অনেক সাহায্য এনেছিল, সে সাহায্যের টাকা কি গরিবের কাজে লেগেছে? তা তো লাগে নি। এদেশের অগনিত মানুষ অনাহারে দিন কাটিয়েছে, শিশুরা অকাল মৃত্যুর কোলে ঝরে পড়েছে, ভিটামিনের অভাবে অন্ধ হয়েছে, মাতৃ মৃত্যু ঘটেছে। যুবকেরা কর্মক্ষমতা হারিয়েছে খাদ্যের অভাবে।

লাভটা কার হয়েছে বিদেশী সাহায্য এনে?

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করেও খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ দুবেলা পেট ভরে ভাত খেয়েছে। ২৬ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে।

আট

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে বঙ্গোপসাগর, সম্পূর্ণ দেশটা ঘিরে আছে বিশাল দেশ ভারত। ক্ষুদ্র অংশ মায়ানমার সীমান্ত। দক্ষিণ এশিয়ার দিকে যদি আমরা তাকাই অথবা এই উপমহাদেশের এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন?

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে পাঁচ বছর মেয়াদ পূরণ করেছি সসম্মানে।

— এরই মধ্যে ভারতে দুটো মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছে।

— পাকিস্তানে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে।

— নেপালে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছে সরকার মেয়াদ পূরণ করতে পারেনি। রাজপরিবারে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। অস্থিতিশীল অবস্থা।

— শ্রীলঙ্কায় মেয়াদ পূরণের পূর্বেই নির্বাচন হয়েছে। যেখানে গৃহযুদ্ধ লেগেই আছে। সেখানে আমরা বাংলাদেশে কোনো তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি করে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি।

—শ্রীলঙ্কায় আর একটি নির্বাচন আসন্ন প্রায়।

— মায়ানমারে আমাদের প্রতিবেশী দেশ সামরিক সরকার দীর্ঘদিন দেশ শাসন করছে।

নয়

প্রতিবেশী দেশগুলোর যেখানে এ অবস্থা সেখানে বিরোধী দলের সরকার উৎখাতের আন্দোলন, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে হত্যার হুমকি, পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে, দিনের পর দিন হরতাল, লুটপাট, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ, জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অফিসে অফিসে বোমা হামলা ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটিয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা কি এতই সহজ কাজ?

বিরোধী দল সৃষ্ট দুর্যোগের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগও তো আওয়ামী লীগ সরকারকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং পাঁচ বছর মেয়াদ পূরণ শেষে সসম্মানে বিদায় গ্রহণ, একটা ইতিহাস আমরা সৃষ্টি করেছি—যা আগামী দিনে যারা বিশ্লেষণ করবেন তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন। আন্দোলন করে সরকার উৎখাতের হুমকি দিয়েও আন্দোলনে জনগণের সাড়া পায়নি কারণ আমাদের দক্ষ

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ সুফল ভোগ করেছে। আর তাই জনগণ বিরোধী দলের আন্দোলনে সাড়া দেয়নি। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা হল। এ কারচুপি বহুমুখী প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে করা হয়েছে। ফলে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। নির্বাচনে কারচুপির বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমি আর একটি লেখায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

দশ

নির্বাচনের পর সহিংস ঘটনায় আজ লাখ লাখ মানুষ গৃহহারা। হাজার হাজার নারী ধর্ষিত, কত মানুষের চক্ষু তুলে ফেলেছে, হাত কেটে দিয়েছে, পা কেটে দিয়েছে, চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে। চারদলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্য হল আর যেন কেউ নৌকা মার্কায় ভোট না দেয়, আওয়ামী লীগ না করে, গ্রামে গ্রামে সে অবস্থা সৃষ্টি করবে। সব থেকে আঘাত এসেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সাবিত্রীও রেহাই পায়নি ধর্ষকদের হাত থেকে। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে চার দলীয় জোট নেতা-কর্মীরা।

নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে মুসল্লির দাড়ি টেনে ছিঁড়েছে। এরাই আবার ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে রাজনীতি করে। মানবতার এত বড় অপমান ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধকে ম্লান করে দিয়েছে।

পোলিং এজেন্ট থাকার অপরাধে নড়াইলের এক মেয়েকে এসিড ছুড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে পাষণ্ডের দল। গফরগাঁও, ভোলা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি, যশোহর, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থানায় এখনও পর্যন্ত এই তাণ্ডব চলছে।

তাদের অপরাধ কি? অপরাধ তারা তাদের সাংবিধানিক অধিকার, ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছে। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছে। নির্বাচনে কাজ করেছে এটাই তাদের অপরাধ।

ঘরবাড়ি লুটপাট, আগুন দিয়ে পোড়ান, অত্যাচার নির্যাতনের ফলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করেছে চার দলীয় জোট সন্ত্রাসীরা, কাজেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারছে না। ক্লাস করতে দিচ্ছে না। তাদের বই খাতা পুড়িয়ে দিয়েছে, কম্পিউটার লুট করে নিয়ে গেছে অথবা ভেঙেছে। চরম অরাজকতা সারা দেশে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কত ছাত্র-ছাত্রীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল—এই কি গণতন্ত্র? মানুষ যদি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে এভাবে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে কি গণতন্ত্র আছে? জনগণ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না তাকে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে মত প্রকাশের ফলে। তাই বাংলাদেশে আজ গণতন্ত্র দারুণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানবতাও আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ঈদসংখ্যা ডিসেম্বর ২০০২

ভোট কারচুপি ঃ বন্দি গণতন্ত্র অসহায় জনগণ

১ অক্টোবর নির্বাচন হয়ে গেল। এবারের নির্বাচনে আপাতদৃষ্টিতে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এটা সকলের কাছে প্রতীয়মান হলেও ভেতরে ভেতরে যে কি গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করেছে তা অনেকেই আনুধাবন করতে পারেননি। কেবল যারা ভোট দিতে গিয়ে ভোট দিতে পারেননি এবং প্রতারণার শিকার হয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যেতে হয়েছে অথবা আচমকা পুলিশ বা মিলিটারির তাড়া খেতে হয়েছে তাদের মনে প্রশ্ন নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে, গেলাম ভোট দিতে, হল কি?

প্রশ্ন আরও অনেকের মনে এসেছে যেমন ভোটার তালিকায় নাম, বাবা বা স্বামীর নাম অথবা ভোটার নাম্বার মেলে না, ব্যাপারটা কি? ভোট দেয়া হল না, ফিরে যেতে হল। আর যারা দিয়েছেন তাদেরও অনেকের মনে প্রশ্ন কাকে ভোট দিলাম আর কে জিতল? হলটা কি?

গত কয়েকদিনে নির্বাচনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার মনেও অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে, সংগ্রহ হয়েছে অনেক ভয়াবহ তথ্য। সব হয়ত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না, প্রাথমিকভাবে যা পেয়েছি তা উল্লেখ করছি। জানি এখন আর কিছু করার নেই তবুও উল্লেখ করছি কারণ যারা ঢালাওভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন

"চমৎকার নির্বাচন হয়েছে।" "অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে"। এই 'অবাধ' 'চমৎকারের' পিছনে যে চমৎকারিত্ব রয়েছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কিছু ক্লু হয়ত পেতে পারেন যদি কেউ অনুসন্ধান করতে চান। আর যারা ভাল বলার তারা তো বলেই যাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে সম্ভাবনাময় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রস্তুতি যে হোঁচট খেল তা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে পরে মানসিক বিকারগ্রস্তের মত এত অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি দেশে শুরু হত না। যারা জিতেছে তারা প্রতিপক্ষকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত না। বিশাল বিজয় নিয়ে তৃপ্ত থাকত কিন্তু কেন তারা তা হতে পারছে না অর্থাৎ চারদলীয় জোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২১৫ আসন পেয়েও কেন নিশ্চিত হতে পারছে না? আওয়ামী লীগের ভোটার, সমর্থক নির্বাচনী এজেন্ট দলীয় নেতা-কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে আর দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ছাড়া করছে, বিশ্লেষণ করলেই এদের দুর্বলতাটা কোথায় তা বেরিয়ে আসবে।

সত্যিকারভাবে যদি জনগণের ভোটে বিজয়ী হত তাহলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকত। আর আত্মবিশ্বাস থাকলে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পথ বেছে নিত না। গভীর ষড়যন্ত্র করে কারচুপির মাধ্যমে ২১৫টা সিট দখল করেছে বলেই এপথ বেছে নিয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ৩৮ ভাগ ভোট পেয়ে ১৪৬টা সিট আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। আর ৪১ ভাগ ভোট পেয়ে ৬২টা সিট কিভাবে পেল? পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রপরিচালনা করার ফলে ভোটের হার বৃদ্ধি পেল অথচ সিট সংখ্যা কমে গেল, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? ৪১ ভাগ ভোটে ৬২টা সিট, আর চারদল মিলে প্রাপ্ত ৪৬ ভাগ ভোটে ২১৫টা সিট, এ অঙ্ক কিভাবে মিলবে? এটা কি সম্ভব?

গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী কেউ কি মিলিয়ে দিতে পারবেন? অনেক পর্যবেক্ষক দল প্রকৃত ফলাফল আর ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে জানেন কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে তারা চুপ হয়ে গেলেন কেন? তবে এর মধ্যে দশভাগ কারচুপি হয়েছে বলে অনেকে স্বীকার করেছেন। তাহলে এই দশভাগে কত সিট হারাতে পারে সে হিসাবও প্রয়োজন। পাঁচ পার্সেন্ট ভোটের ব্যবধানে সিটের ব্যবধান ৬২ থেকে ২১৫ হতে পারে তা হলে ১০% কারচুপিতে এ ব্যবধান কি উল্টোফল হতে পারত না? আমার প্রশ্ন–আমার দেশের সাধারণ মানুষ কি অন্যায় করেছে? বারবার তারা কেন এ ধরনের প্রতারণার শিকার হবে? রক্ত দিয়ে অধিকার আদায় করবে আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হারাবে অর্জিত অধিকার, কেন? আর কত কষ্ট করবে আমার দেশের মানুষ? সাধারণ মানুষের এ কষ্টের দিন কি শেষ হবে না? বড় কষ্ট হয়, বড় দুঃখ হয় সাধারণ মানুষের কথা ভাবলে। আর তাদের কথা যে ভাববে, কিছু করতে চেষ্টা করবে তাকেও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা কি কোনো দিন প্রতিষ্ঠিত হবে না?

নির্বাচনী যে প্রহসন বা ড্রামা হয়ে গেল তা নিয়ে কিছু বলতে চাই এবং এই সূত্র ধরে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যারা চান বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাতে করে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। হয়ত ভবিষ্যতের জন্য পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এই দুর্বলতাগুলো শোধরানোর চেষ্টা করা যেতে পারে যদি কেউ আন্তরিকভাবে চায়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্র শুরু হয় কিভাবে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করা যায়। কারণ সে নির্বাচনেও কারচুপির মেকানিজম ছিল কিন্তু তা কাজে লাগেনি। জনগণের ভোটের স্রোতে তা ভেসে গিয়েছিল। আর তাই এবারের কোনো রাখঢাক নয়, কোনো সূক্ষ্ম ব্যবস্থা নয়, একেবারে স্থুল কারচুপির পথ বেছে নিয়েছিল। জনগণ কাকে ভোট দেবে না দেবে তা নয়, জিততেই হবে, সিট কেড়ে নিতেই হবে তার জন্য মরীয়া হয়ে সব

নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে নেমেছিল। যদিও এর ফলে অতীতের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো জনগণের কাছে ধরা পড়েনি, এবারে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রপরিচালনা করে পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে সসম্মানে বিদায় নিতে পেরেছি এই তৃপ্তি নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরেছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত থেকে যা ঘটতে শুরু করল তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হলাম। বিষপান করতে করতে নীলকণ্ঠ হলাম গণতন্ত্রের স্বার্থে। কি ঘটেছিল একের পর এক আমি এখন তা তুলে ধরব।

নির্বাচনে ভোট কারচুপির পদ্ধতি গ্রহণে

১. প্রশাসনে হয়রানিমূলক বদলি

কোনো নিয়ম না মেনে গণবদলি করে সকলের মাঝে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা। ফলে প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা এসে যায় এবং চিহ্নিত (মোটিভেটেড) কিছু কর্মকর্তা হঠাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ পায়– যারা ৪ দলীয় জোটের অনুকূলে কাজ করে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বেই জোটের পছন্দমত কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দান করা হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো মতামত দিলে তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কথাবার্তা, মতামত প্রকাশ, সবই আওয়ামী লীগকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে করা হয়, যা নির্বাচন কমিশনে কর্মরত অন্য কর্মকর্তাদের মাঝেও প্রভাব বিস্তার করে। আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এখানে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কোনো দল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে এ ধরনের বক্তব্য বাঞ্ছনীয় ছিল না।

নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর যেসকল কর্মকর্তা নিরপেক্ষ ছিলেন একে একে তাদের বদলি করে দেয়া হয়। জামাত বিএনপির

পছন্দমত কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়– আওয়ামী লীগের কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করা হয় নি, যা নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রধান উপদেষ্টা শপথ নেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ ১৩ জন সচিবকে বদলি করা হয়। ফলে সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হয়। অফিসের সময়সূচি বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত, প্রধান উপদেষ্টা শপথ নেন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। এবং রাত ৯টা পর্যন্ত সচিবালয়ের অফিস খোলা রেখে এই বদলির নির্দেশ দেয়া হয় যা সম্পূর্ণ সংবিধান পরিপন্থীই শুধু নয় নিয়মনীতি বহির্ভূত।

প্রধান উপদেষ্টা এবং দশজন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হবে এবং সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করবে। কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারে প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণে সরকার গঠন হয় না যতক্ষণ না উপদেষ্টাগণ শপথ নিবেন। কাজেই প্রধান উপদেষ্টা প্রথমে শপথ ভঙ্গ করেন। সংবিধান ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী সংস্থা, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, ক্রীড়া ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংস্থায় ব্যাপকহারে গণবদলি করতে শুরু করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদচ্যুত করে। এমনকি যে সকল সংস্থার সাথে নির্বাচনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই সেগুলোও বদলি করা হয়–কেন?

জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিকেও সরিয়ে দেয়া হয় এবং একটা মিথ্যা বানোয়াট খবর একটা মাত্র পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাপিয়ে সরাবার সুযোগ সৃষ্টি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। তাকে সরাবার উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে নির্বাচনে যে কারচুপি করা হবে তা যাতে তুলে ধরতে না পারে। যেহেতু আনোয়ারুল করীম চৌধুরী জয়ের জাতিসংঘে বিশেষ সুনাম ও গ্রগণযোগ্যতা রয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে সেহেতু তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে সরানো হয় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থেকে।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন কারচুপির নির্বাচনে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সিট পেয়ে ক্ষমতায় যায়। সেই নির্বাচন দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। ব্যাপক গণআন্দোলন হয় ফলে ৩০ মার্চ ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের পতন ঘটে। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে রাজত্ব হারিয়ে উন্মাদ প্রায়। কাজেই এবারের নির্বাচনে কারচুপির লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রেই আঁটঘাট বেঁধেই তারা প্রস্তুত হয়। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হলে নির্বাচনের ৪/৫ দিন আগে থেকেই ফলাফল সম্পর্কে তারা সকলে যেন নিশ্চিত এমনভাবে প্রচারও শুরু হয়। ঢাকা ক্লাবে মদ্যপানরত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তো বলেই দিল আওয়ামী লীগ ৬০টা সিট পাবে। নীল নক্সা না হলে এ তথ্য পেল কিভাবে?

ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন থেকে সরবরাহ করা হয়। ভোটার তালিকা সিডি করে বিক্রি করা হয়। ভোটার তালিকা দুই ধরনের দেয়া হয়। বিএনপি-জামাত জোট প্রার্থীদের একটা তালিকা দেয়া হয়। আর আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে অন্যরকম দেয়া হয়। রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নির্বাচনের দিনে যে ভোটার তালিকা সরবরাহ করা হয় তার সাথে ৪ দলীয় জোটের প্রার্থীদের ভোটার তালিকায় এবং ভোটার নম্বরে মিল ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে দেয়া প্রদত্ত ভোটার তালিকার সঙ্গে মিল ছিল না এবং ভোটাররা ফেরত আসে ভোট দিতে না পেরে। অনেকের হাতে কালি লাগানোর পর বলা হয় যে, আপনি ভোট দিতে পারবেন না। নম্বর মেলে না।

২. ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত

নির্বাচনে কোন কোন কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ তা চিহ্নিত করার পদ্ধতি কি?

নির্বাচন কমিশন এ ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? এক একটি নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীরা যার যার এলাকায় যে সকল কেন্দ্র

ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে তার তালিকা করেছে নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্নিং অফিসারের কাছে সে তালিকা দিয়েছে। কোনো প্রার্থী যদি কোনো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে তবে সে সেই সকল কেন্দ্রের নাম দিতে পারে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সে সকল কেন্দ্রে ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আওয়ামী লীগ প্রার্থী যে সকল কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে এবং তালিকা দিয়েছে সে সকল কেন্দ্র ভোটারদের ভোটদানের কোনো নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা হয় নি। বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের একটা তালিকা পাঠানো হয়। ঠিক যে সকল কেন্দ্রে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বেশি ভোট পেয়েছে সেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সাথে একটা সন্ত্রাসীদের তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই তালিকা কোথা থেকে করা হল? আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় আমলা কর্তৃক তৈরি নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, আওয়ামী লীগী প্রার্থীর পক্ষে ভোট যাতে কম হয় সে উদ্দেশ্যে এই তালিকা করা হয়েছিল যা প্রধান উপদেষ্টার হাতে দেয়া হয়। তিনি তা সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র তালিকা জেলায় পাঠানো হয়। এখানে আর একটি কাণ্ড ঘটানো হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সাথে সন্ত্রাসীদের তালিকা করা হয়। এই তালিকায় প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা, যারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তালিকা প্রত্যেক ডিসি ও জিওসির কাছে পাঠানো হয়।

এমনি একটি তালিকা আমাদের হাতে আসে। যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ভৈরব আর সন্ত্রাসী হিসেবে এক নম্বর জিল্লুর রহমানকে দেখানো হয়। জনাব জিল্লুর রহমান একজন এডভোকেট। বর্ষীয়ান নেতা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, প্রবীণ, সজ্জন, নম্র

ভদ্র মানুষ। যিনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংসদে উপনেতা ছিলেন, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ছিলেন। যিনি জোরে একটা কথাও বলতে জানেন না, যার নম্রতা সর্বজনবিদিত। তাকে সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কি আশ্চর্য ঘটনা।

ঠিক আর একটি তালিকায় জাতীয় সংসদের স্পীকারের নাম সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্র মিঠামইন উল্লেখ করা হয়। ঠিক এমনিভাবে সমগ্র বাংলাদেশের তালিকা প্রস্তুত করে সেনাবাহিনীর হাতে পৌঁছানো হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অফিস থেকে এই তালিকা সেনাবাহিনীর কাছেও প্রেরণ করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারির টেলিফোন নির্দেশে তালিকা যায়।

এ তালিকাও সরবরাহ করা হয় বিএনপির নির্বাচনী অফিস থেকে। বিএনপি নেত্রীর উপদেষ্টা প্রাক্তন এক সচিব বিভিন্ন তালিকা সরাসরি প্রধান উপদেষ্টাকে দিতেন। প্রধান উপদেষ্টা সেই মোতাবেক পদক্ষেপ নিতেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই তালিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সাহেবকে জানানো হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকলকে জানানো হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা সরবরাহের কথা স্বীকার করা হয় কিন্তু সন্ত্রাসীদের কোনো তালিকা তারা পাঠায়নি বলে জানায়।

রাষ্ট্রপতি কোনো প্রতিকার তো করেনইনি বরং মনে হয়েছে আরও উৎসাহ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সেনাবাহিনী দিয়ে শায়েস্তা করতে। ধীরে ধীরে অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে।

তাহলে প্রশ্ন হল, এ তালিকা কোথা থেকে এল? প্রশ্ন হল, এ তালিকা সেনাবাহিনীর হাতে কিভাবে পাঠান হল? বিভাগীয় কমিশনার বা ডিসির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কাছে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের ও সন্ত্রাসীদের তালিকা দেয়া হয়েছে? নাকি ঢাকা থেকে সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার

দপ্তর থেকে তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে? নির্বাচনী আইন, নীতিমালা, বিধিমালা অনুযায়ী কারা এ তালিকা সরবরাহ করার এখতিয়ার রাখে? নির্বাচন কমিশন কি তালিকা পাঠাবার দায়িত্বপ্রাপ্ত? এ প্রশ্নের উত্তর জাতি কি কোনো দিন জানতে পারবে?

৩. এই তালিকা কিভাবে ব্যবহার করা হল?

বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হল। বলা হল সেনাবাহিনী সিভিল প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে যেখানে প্রয়োজন হবে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে যেভাবে সিভিল প্রশাসন সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিল।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে দেখা গেল সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতা, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যিনি আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা, মেম্বার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দশ থেকে বিশ জনের তালিকা স্থান বিশেষে স্থানীয় নির্বাচনী পরিচালনা অফিসে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। সে চিঠিতে স্থানীয় নেতাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। হবিগঞ্জে এ ধরনের চিঠি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক জায়গায়ও পাঠানো হয়েছে।

এসকল নেতা-কর্মীকে কোথাও নির্বাচনের সাতদিন পূর্বে, কোথাও তিনদিন পূর্বে, কোথাওবা একদিন পূর্বে আবার কোথাও নির্বাচনের দিনে হয়রানি করা হয়েছে। এই সকল নেতা-কর্মী ও চেয়ারম্যানদের বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করে ক্যাম্পে বসিয়ে রাখা হয়েছে। জনসমক্ষে হাত বেঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। নদী অথবা ডোবা বা পুকুরে চোবান হয়েছে। বাধ্য করা হয়েছে পানিতে ডুব দিতে। যেখানে পানি কম সেখানে একবার উপুড় হয়ে একবার চিৎ হয়ে ডুব দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কোথাও রোদের মধ্যে সূর্যের দিকে মুখ করে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। গরম পানিতে শরীর ঝলসে দেয়া

হয়েছে। কোন বর্ষীয়ান নেতা, অথবা নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকে মিলিটারি জিপে বসিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনের দিনে হাত পিছ মোড়া দিয়ে বেঁধে ঘোরানো হয়েছে। এর ফলে নেতা-কর্মীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সেনাবাহিনীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা একেবারে শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন সাহেব অনুমোদন দেন ফলে তারা গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হয়রানি করার সুযোগ পায়।

৪. ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের দিনে কি হয়েছে?

যে সকল ভোটার নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে এবং লাইনে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ করে লাইনের ওপর হামলা করা হয়েছে যাতে ভোটাররা ভোট না দিয়ে জীবন বাঁচাতে সরে পড়ে। বুকে নৌকার ব্যাচ দেখলেই সেই ভোটারদের অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে ফলে অন্য ভোটাররা ব্যাচ খুলে ফেলেছে এবং ভোট না দিয়ে চলে গেছে। বেধড়ক লাঠিপেটা করা হয়েছে। এ অত্যাচার থেকে মহিলা ভোটাররাও রেহাই পায়নি। মহিলা এজেন্টদেরও অপমান করা হয়েছে।

ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কি ঘটেছে? এসব ঘটনা একটা নির্বাচনী এলাকার সকল ভোট কেন্দ্রে ঘটেনি। দশ থেকে পনেরোটা ভোট কেন্দ্রে একশত চল্লিশ অথবা একশত পঁয়তাল্লিশটি নির্বাচনী এলাকায়। বিশেষ করে যেসকল নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অল্প ভোটে জিতেছে এবং অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরেছে সেখানে এবারের নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ কয়েকজন সংসদ সদস্যকে চিহ্নিত করে তাদের নির্বাচনী এলাকায় এই ধরনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে আওয়ামী লীগকে হারানো হয়েছে। আমি আরও কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি।

৫. নমুনা ব্যালট পেপার

নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রগুলো যেখানে কারচুপি করা হবে সেখানে অতিরিক্ত ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে। আবার সাধারণভাবে সকল ভোট কেন্দ্রে নমুনা ব্যালট দেয়া হয় ভোট কিভাবে দিতে হবে তা শেখানোর জন্য। এবারে নমুনা ব্যালট দেখা গেল ঠিক এক একটি নির্বাচনী এলাকায় যে ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হবে হুবহু সেই ব্যালট পেপার নমুনা হিসেবে সরবরাহ করা হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শেরপুরে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর এলাকায়।

প্রশ্ন হল, এ ধরনের নমুনা ব্যালট পেপার যা হুবহু মূল ব্যালট পেপারের অনুরূপ তা কত হাজার দেয়া হয়েছিল, কাদের কাছে সে ব্যালট পেপার দেয়া হল এবং ব্যালট পেপারে যে সিল মারা হয়েছিল সে ব্যালট পেপারগুলো কি নষ্ট করা হয়েছিল না কি নির্বাচনের দিন কোনো ব্যালট বাক্সে ভরে রাখা হয়েছিল? মোট কত অতিরিক্ত ব্যালট দেয়া হয়েছিল সে হিসাব নেই তবে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত ব্যালট পেপার সরবরাহ করার কথা স্বীকার করেছে। অতিরিক্ত ব্যালট পেপারের হিসাব কি পরে নেয়া হয়েছে? কত অতিরিক্ত ব্যালট পেপার কত ভোট কেন্দ্রে দেয়া হয়েছিল? সেগুলো কি কাজে ব্যবহার হল? সমগ্র বাংলাদেশেই ঘটেছে। নির্বাচন কমিশনে কি হিসাব আছে কোন ব্যালট পেপার কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় দেয়া হয়েছিল নমুনা হিসেবে এবং সেগুলো কোথায় গেল? নির্বাচনের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলেছে কি-না? সেগুলো চারদলীয় জোট প্রার্থীর পক্ষে সিল মেরে বাক্সে ভরে দেয়া হয়েছে কি-না বা অতিরিক্ত ব্যালট পেপার যে দেয়া হয়েছিল সেগুলো কোথায় গেল, নির্বাচন কমিশন ফেরত পেয়েছে কি-না?

প্রতিটি কেন্দ্রে দুই বাক্স থেকে তিন বাক্স অতিরিক্ত ভোট গোনার সময় যোগ দেয়া হয়েছে, সেগুলো কিভাবে এল, এ সমস্ত নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী, এজেন্ট যখন কথা বলেছে, প্রশ্ন তুলেছে তখন

অনেককে বের করে দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর অফিসাররা অপদস্থ করেছে। রিটার্নিং অফিসার অপমান করেছে। এমনকি গোনার সময় থাকতে দেয়নি। যদি তথ্য সংগ্রহ করা হয় দেখা যাবে অনেক ফলাফল এসেছে যেখানে আওয়ামী লীগের এজেন্টদের সই নেই।

ভোট গণনার সময় কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা গেছে মোট যে ভোট তাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী যে ভোট পেয়েছে এর থেকে বাকি যে সকল অন্য দলের প্রার্থীরা যে ভোট পেয়েছে সেগুলো সব একত্রে চারদলীয় ভোট হিসেবে দেখান হয়েছে এবং বাকিদের শূন্য ভোট দেখিয়ে বান্ডিল করা হয়েছে। কারচুপির এটা একটা প্রক্রিয়া। ভোটার বান্ডিল ১০০ টা ব্যালট পেপার দিয়ে করা হয়। সেখানেও কারচুপি করা হয়েছে যাকে জেতাতে হবে তার ভোট কম থাকলেও আশিটা ব্যালট দিয়ে একশত দেখান হয়েছে আর যাকে হারাতে হবে তার বান্ডিলে ১১০ বা ১২০টা বেঁধে ১০০ দেখান হয়েছে। এব্যাপারে কোনো আপত্তি কানে তোলা হয়নি।

নির্বাচনে দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষক অনেক এসেছেন। দেড় লক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়েছে যার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পর্যবেক্ষক কার্ড নাম ছাড়া সই করে দেয়া হয় যা চারদলীয় জোটের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। এ কার্ডধারীরা ভোট কারচুপির জন্য ব্যালটে সিল মেরেছে এবং বাক্স ভরেছে। এই কার্ডগুলোয় যেহেতু কোনো নাম লেখা ছিল না কাজেই সেগুলো ইচ্ছামত বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন N.G.O. সংস্থার নাম মুদ্রিত করে ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নাম ছাড়া এ ধরনের পর্যবেক্ষকের কার্ড কেন সরবরাহ করল এবং এদের গাড়ি ব্যবহার ও ভোট কেন্দ্রে যাবার অনুমতি কেন দিল? তারা কে কি করেছে সে বিষয়ে কি তারা কখনও খোঁজ নিয়েছে?

অনেক ভোট কেন্দ্রে ভোট শুরুর পূর্বে রেজাল্ট সিটে বিভিন্ন দলের এজেন্টদের সই নিয়েছে এই বলে যে—এখানে একটি সই দেন ভোট শুরু করব। যারা অতীতে এজেন্ট ছিল তাদের একজন নৌকার

এজেন্ট চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটা হতে পারে না যে ভোট শুরুর আগেই রেজাল্ট সিটে সই দিতে হবে। কিন্তু যারা নতুন তারা বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ সই দিয়ে ফেলেছে। কাজেই রেজাল্ট ইচ্ছামত তৈরি করা হয়েছে।

৬. মহিলা ভোট কেন্দ্রে কারচুপি বেশি

মহিলা ভোট কেন্দ্রে বুথ কম রাখা হয়েছে। ৫/৬ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে অনেকে ভোট না দিয়ে চলে গেছে। বাইরে লম্বা লাইন কিন্তু ভেতরে বুথ খালি দেখা গেছে। তখন ইচ্ছেমত সিল মেরে বাক্স ভরা হয়। অনেক শিক্ষিত মহিলাকে ব্যালটের কাউন্টার পেপারে সই দিতে দেয়া হয়নি, টিপ সই নেয়া হয়েছে। যারা নাম লিখতে পারে তাদের কাছ থেকে টিপ সই কেন নেয়া হবে? টিপ সইসহ জাল ভোট দিতে সুবিধা কারণ এগুলো কখনও আর যাচাই করা হয় না। খোদ ঢাকা শহরেও এ ঘটনা ঘটেছে।

চারদলীয় মহিলা কর্মী যারা জিন্সপ্যান্ট অথবা স্কার্ট উপরে বোরখা লাগিয়ে হঠাৎ পর্দানশীল হয়েছে শুধু জাল ভোট দেয়ার সুযোগ নেয়ার জন্য।

হিন্দু ভোটারদের ভোটার তালিকায় স্বামীর নাম মুসলমান কেন দেয়া হয়েছে, আবার কেউ যখন নাম বলেছে তালিকার সঙ্গে মিলেনি তাকে হাতে কালি লাগিয়ে ফেরত দেয়া হয়েছে।

অনেক ভোটারকে হাতে কালি দিয়ে বলা হয়েছে এই বুথে আপনার ভোট নেই অন্য বুথে যান। সরল বিশ্বাসে সে যখন অন্য বুথে গেছে ভোট দিতে সেখান থেকে বলা হয়েছে আপনি ভোট দিয়েছেন হাতে কালি, ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। প্রতিবার হিসাব হয় আওয়ামী লীগ মহিলা ভোট কম পায়। কিন্তু এবার আসল রহস্য উদঘাটিত হল। মহিলা ভোট কেন্দ্রে কারচুপির কৌশল গ্রহণ সহজ।

চারদলীয় জোট ভোটারদের কাছে একের অধিক ব্যালট পেপার দেয়া হয়েছে— যা তারা বাক্সে ভরেছে। মেয়েদের পক্ষে লুকিয়ে

ব্যালট নেয়া অনেক সহজ। কোনো কোনো ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের যখন একের অধিক ব্যালট দেয়া হয়েছে নৌকার এজেন্ট আপত্তি করেছে তখন তাকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ঢাকায় অনেক কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটেছে। ঢাকায় যদি ঘটতে পারে তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় কি ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৭. মিডিয়া ক্যু

নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কারচুপির শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে প্রধান নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে ফলালল ঘোষণার মাধ্যমে। যে সকল নির্বাচনী এলাকায় সিট কেড়ে নেবে সে তালিকা তাদের কাছে আগেই তৈরি হয়েছিল।

একটি বিদেশী সংস্থা থেকে আমাকে গোপনে পূর্বেই জানায় যে, রাত ১২টার পর থেকে মিডিয়া ক্যু শুরু হবে। ঠিক তা-ই ঘটল।

দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক এসেছেন। পর্যবেক্ষকরা সকালে বেরিয়েছেন নির্বাচনী কেন্দ্রে, লম্বা লাইন দেখেছেন। কেউ কেউ হয়ত একটু ঘুরে দেখেছেন নির্বাচনী কেন্দ্র কয়েক মিনিট—ভেতরের এত কাণ্ড তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। আর যারা জানেন তারা অনেকে কথাও বলেননি। কি কারণে?

প্রধান নির্বাচন কমিশনে আমাদের যে কমিটি দায়িত্বে ছিল তারা সেখানে যে অনিয়ম দেখে তার প্রতিবাদ জানায় কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকার পাবে কার কাছে? যারা প্রতিকার করবে তারা নিজেরাই এর সঙ্গে জড়িত। একজন প্রাক্তন সচিব, ছাত্র রাজনীতিতে চৈনিকপন্থী ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিদেশে ডক্টরেট ডিগ্রি আনতে যান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশে পাঠিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। আমাদের সরকারের আমলে চারদিনের অনুমতি নিয়ে নেপালে একটা সেমিনারে যান, সেখানে থেকে সরকারের অনুমতি ছাড়া দুই মাসের অধিক

আমেরিকায় অবস্থান করেন। সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে এটা গর্হিত কাজ। ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং হতে পারে। সেটাই নিয়ম। মুক্তিযোদ্ধা তাই কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে, যেহেতু চাকরিতে পঁচিশ বছর হয়ে গেছে তাই সসম্মানে বিদায় দেয়াটাই সমীচীন মনে করি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেউ অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। অন্তত সে যে অন্যায় করেছে তা বুঝতে দেয়া উচিত। সেই কর্মকর্তা আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরে সক্রিয় থাকেন এবং নির্বাচনের দিন আরও দুজন কর্তব্যরত সচিব নিয়ে নির্বাচন কমিশনে রাত ১১ টার পর থেকে উপস্থিত হন এবং নির্বাচন কমিশনের সচিবের ঘরে বসে ফলাফল মনিটর করেন। যদিও এখানে তাদের থাকার কথা নয়। নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব খাটিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

ফেনীতে রিটার্নিং অফিসে যখন ভোট গণনা চলছে তখন রেডিওতে শোনা গেল যে ফেনীর ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। কিশোরগঞ্জের একটি নির্বাচনী এলাকায়ও একই ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার সেগুনবাগিচায় রিটার্নিং অফিসে ভোট গণনা করার সময় বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে এবং নির্বাচনী এলাকার ভোটের রেজাল্ট প্রিসাইডিং অফিসার নিয়ে এলে তাদেরকে রেজাল্ট বাইরে পাহারারত আনসারের কাছে রেখে চলে যেতে বলা হয়। কলাপসিবল গেট বন্ধ। রেজাল্ট সই করে গ্রহণ করারও কেউ ছিল না। অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রের রেজাল্টের প্রয়োজন সেখানে ছিল না, কেননা রেজাল্ট তৈরিই ছিল।

প্রার্থীদের প্রতিনিধিকেও ভোট গণনায় থাকতে দেয়া হয়নি। শুনেছি চারদলীয় কোনো এক প্রার্থী ভিতরে থেকে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে। গেট খোলা হয়নি, অন্য দলের প্রার্থীদের বা এজেন্টদের পাত্তাও দেয়া হয় নি।

নির্বাচন কমিশনের একজন কর্তব্যরত কর্মকর্তার বক্তব্যই ছিল রেজাল্ট একবার ঘোষণা দিলেই হল। তারপর কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করতে করতে সময় শেষ। এ ধরনের মনোবৃত্তি যে সকল কর্মকর্তার

তাদের রেখে নির্বাচন কিভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে? বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন উপলক্ষে এই কর্মকর্তা যখন সফর করেন তখন এই মেসেজ সকল রিটার্নিং অফিসে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন।

৮. স্যারকে জেতাতে হবে —

এ বক্তব্য এক সেনা কর্মকর্তার। কেননা পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের এই আসনে প্রার্থী হন বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

১৯৯৬ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট পেল অথচ ২০০১ সালে শূন্য ভোট অথবা ৬ বা ২৮ ভোট এবং চারদলীয় জোটে ১০০% ভাগ ভোট পড়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগের অনেক শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। অন্তত উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম কমিটির সদস্য ও তাদের পরিবারের ভোট তো রয়েছে, তারা তো ভোট দেবে, অন্তত যিনি এজেন্ট ছিলেন তিনি নিজের ভোট তো দেবেন। শূন্য ভোট কিভাবে পড়বে?

আওয়ামী লীগের প্রতি জেলায় থানা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম কমিটি রয়েছে –এই সদস্য, নেতা-কর্মী ও তাদের পরিবারদের ভোট কোথায় গেল? বিএনপি বা চারদলীয় জোটের শরিক দলের সংগঠন বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে অনেক জায়গায় নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ ৫২ বছরের সংগঠন, তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন কেবল আওয়ামী লীগেরই আছে। শূন্য ভোট হতে পারে না।

সিলেট-১ এ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে ১১৫ ভাগ ভোট পড়েছে ধানের শীষের পক্ষে। এ ঘটনা মহেশখালীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়ও ঘটেছে।

সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ.এম.মুহিতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিএনপির সাবেক অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুর রহমান। এই আসনে ভোট কেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট,

নেতা-কর্মী ও ভোটারদের পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়। আগের দিনই নিরাপত্তারক্ষীরা অনেককে আটক করে। কদমতলী ও মির্জা জাঙ্গালের সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে না যাবার জন্য আগে থেকে হুমকি দেয়া হয়। ভোটের দিন সকালে তাদের বাড়িতে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা ভোট দিতে যেতে না পারে। উপশহর ভোটকেন্দ্রে পোলিং বুথ ছিল ৪টি, এখানে ভোট পড়েছে ১১ হাজারেরও বেশি। একটি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৮১৫টি কিন্তু ভোট কাস্টিং দেখানো হয়েছে ৩২৫৩। অর্থাৎ ভোটের হার ১১৫.৫৫ শতাংশ। সিলেট শহরের দুর্গাকুমার পাঠশালা ভোটকেন্দ্রে বেশ কিছু তরুণ ভোট দেবার সময় পকেট থেকে ন্যাপকিনে মোড়া অতিরিক্ত ব্যালট পেপার বের করে ভোট বাক্সে ফেলে দেয়। এসব অতিরিক্ত ব্যালট পেপার তারা কোথায় পেল? জানা যায় ভোট কেন্দ্রের কাছেই হকার্স মার্কেটে অবস্থানরত এক দল ছাত্রদল কর্মী এভাবে ২০/২৫ বার ভেতরে গিয়ে ভোট দেয়। তাদের হাতে সিল ও ব্যালট পেপারও দেখা গেছে। অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

একটা সূক্ষ্ম কারচুপির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন চারদলীয় জোটের যোগসাজশে আওয়ামী লীগের ১৪০-১৪৫টি মজবুত আসন চিহ্নিত করে রাখে। এসব স্থানের জন্য তারা চারদলীয় জোটের অনুগত ও সমর্থক জেলা প্রশাসক, এসপি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ওসিদের বদলি করে। তারা ৪০-৫০টি ভোট কেন্দ্র বাছাই করে নিজেদের মনোনীত প্রিসাইডিং, পোলিং ও পুলিশ অফিসার নিয়োগ দেয়। পোলিং অফিসার হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা থাকলেও তারা ইসলামী ব্যাংকের অফিসারদের নিয়োগ দিল কেন? জামাতের সমর্থন অটুট রক্ষার জন্য?

ভাতের হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে যেমন জানা যায় সব ভাত সিদ্ধ হয়েছে তেমন একটা কেন্দ্র ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে সকল নির্বাচনী এলাকায় কারচুপি করা হবে এবং সেখানে

কিভাবে কি পদ্ধতিতে কারচুপি করা হবে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় এবার মিডিয়া ক্যু হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে সবাই স্বীকার করবেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ফলাফল রাত ১২ টার মধ্যে ঘোষণা হয়ে গেল অথচ ঢাকা শহরের ৮টি আসনের ফলাফল ঘোষণা করতে ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা বেজে যায়। এর কারণ কি?

মুন্সীগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হন মহিউদ্দিন আহমেদ। এখানে ৪৬টি কেন্দ্রে তিনি ভোট পান ৫৯,৯৯৬টি এবং চার দলীয় জোট ভোট পায় ৪১,৫৮৪টি। মুন্সীগঞ্জ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাবার পর এবং রিটার্নিং অফিসার রেজাল্ট লিখে নৌকার প্রার্থীর বিজয় ঘোষণা করে ফলাফল হাতে তুলে দেবার পর আবার নতুন করে চারটা ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে পুনঃ নির্বাচন ঘোষণা করে। অথচ বিজয়ী প্রার্থীর কাছে রিটার্নিং অফিসারের লেখা ফলাফল রয়েছে। ভোট গ্রহণ শেষ হবার পর প্রায় ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যায়, এরপর কিভাবে কেন্দ্র বাতিল হয়? হাইকোর্টে বিচার চেয়েও বিচার পাওয়া যায়নি। তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? আওয়ামী লীগকে ৬০টা দেবে, ৬২টা পেয়েছে, এটা পেলে ৬৩ হবে তাই আর দেয়া যাবে না।

৯. সন্ত্রাসী তাণ্ডব

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিএনপি জামাতের চারদলীয় জোট সমর্থক সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। একজন উপদেষ্টা মুয়ীদ চৌধুরী শপথ নিয়েই টেলিভিশন সাক্ষাতে বলেন যে, তার কাছে নাকি এমন ফর্মুলা আছে যা প্রয়োগ করে মুহূর্তে সন্ত্রাস বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ করতে তারা পারেননি বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন একের পর এক। প্রতিদিন খুনখারাবি বেড়ে যায়, কেবল আওয়ামী লীগের শত শত নেতা-কর্মী-সমর্থক খুন হয়, হাজার হাজার

নেতা-কর্মী আহত হয়। সন্ত্রাসীদের তারা গ্রেপ্তারও করেননি, কোনো ব্যবস্থা নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন যা নির্বাচনের দিনে এবং নির্বাচনের পরে ভয়াবহ রূপ নেয়। ফর্মুলাটা কি?

এ ধরনের অসংখ্য প্রক্রিয়া চারদলীয় জোটের পক্ষে করা হয়েছে। মূল কথা হল ক্ষেত বাঁচাতে বেড়া দিলাম, বেড়া দেখি ক্ষেত গ্রাস করছে। জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আন্দোলন, সংগ্রাম করে, রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলাম, কিন্তু দুঃখজনক হল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারল না। আওয়ামী লীগকে যেন প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা চিহ্নিত করল এবং আওয়ামী লীগ ঠেকাও এই মনোভাবই তাদের মধ্যে দেখা গেছে যা নির্বাচনে চরম প্রভাব ফেলেছে। চারদলীয় জোটকে জেতাতে হবে সে লক্ষ্যে সকল শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি নিরপেক্ষ থাকত যা তাদের ভূমিকা হবাব কথা, তাহলে প্রশাসন, সেনাবাহিনী, নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হত। অন্তত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করাই ছিল সাংবিধানিক অঙ্গীকার যা তারা ভঙ্গ করেছে। আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ যার কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করেছে জনগণ, তিনিও আওয়ামী লীগ ঠেকাও মনোভাব দেখালেন। তার কাছে থেকেও নিরপেক্ষতা পাওয়া গেল না। কি দুর্ভাগ্য এ জাতির।

১ অক্টোবরের পর থেকে নারী ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল শুরু হয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। চাঁদাবাজির হাত থেকে পান, বিড়ি, সিগারেট দোকানদার, ফেরিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। যেসব মামলার আসামি বিএনপি তাদেরকে বাদ দিয়ে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের আসামি করে দেয়া হচ্ছে রাজনৈতিক নির্যাতন করার জন্য।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়ি-ঘর আক্রমণ, মারধর, অত্যাচার করার পর অস্ত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে মিথ্যে মামলা দিয়ে দিচ্ছে। অথচ অত্যাচারিত হবার পর থানায় মামলা দিতে গেলে মামলা নিচ্ছে না—কি অত্যাচার নির্যাতন অন্যায় অবিচার। বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে যা অতীতে ছিল না।

গার্মেন্টস দখল, গার্মেন্টস-এর কাটা কাপড়কে ঝুট বলে তা নিয়েও দখলবাজি খুন খারাবি চলছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় দেড় হাজার গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। লাখ লাখ মেয়ে চাকরি হারিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার ওপর যদি এ অত্যাচার জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা চলতে থাকে আরও গার্মেন্টস বন্ধ হবে, আরও পনেরো লাখ শ্রমিক চাকরি হারিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হবে যা পরোক্ষভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। নির্বাচনটা যদি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হত তাহলে এই সকল মস্তানদের প্রভাব থাকত না। বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এবং বিভিন্ন উপায়ে কারচুপি করে চারদলীয় জোট শধু অর্জিত গণতন্ত্রকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেয়নি অর্থনীতিকেও সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। প্রার্থী হবার ঘুষ, নির্বাচনের খরচ, মন্ত্রী হবার ঘুষ সবকিছু উসুল তোলার প্রতিযোগিতা বর্তমানে আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যা শুধু বর্তমান প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বে তা নয় ভবিষ্যৎও অন্ধকারের পথে যাবে। সর্বত্র চরম বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে যা আবার শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনা হবে অত্যন্ত কঠিন কাজ।

উপসংহারে এটুকুই বলতে চাই অনেক কারসাজি করে আওয়ামী লীগকে হারানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারেনি। চারদলীয় জোট ক্ষমতায়। কিছু মানুষের লাভ হয়েছে, অর্থ-সম্পদের মালিক হবার সুযোগ হয়েছে। আরও কিছু ধনিক বণিক শ্রেণী অর্থে বিত্তে আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। কিন্তু আমার দেশের মানুষের কি হবে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। অসহায় মানুষ, অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার, ধর্ষিত

মা-বোনের আহাজারি, তাদের জীবনের এই সর্বনাশের জন্য তারাই দায়ী থাকবেন চিরদিন যারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছেন। কারচুপির ফন্দিফিকির এঁটেছেন। নিরপেক্ষ থাকার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। নির্যাতিতদের আহাজারি, যন্ত্রণার অভিশাপ থেকে এরা কোনদিন মুক্ত হতে পারবে না।

নির্বাচনের পর সমগ্র দেশে আজ চরম অরাজকতা। এত মানুষের মৃত্যু। হাজার হাজার মা-বোন ধর্ষিত। আওয়ামী লীগের অগনিত নেতা-কর্মীর হাত নেই, পা নেই, চক্ষু নেই। ধর্ষিত মা-বোনের এই ক্রন্দন আহাজারি এর দায়-দায়িত্ব কি এড়াতে পারবেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাঈদ সাহেবরা?

গণতন্ত্র বিকশিত হবার, দৃঢ় মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার যে সম্ভাবনা ছিল সে সম্ভাবনার কবর দিলেন তারা যারা এ প্রক্রিয়ায় কোনো না কোনোভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির যে সোনালি সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছিল তাও আজ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভেঙে গেল। এর জন্য তারাই দায়ী যারা এ প্রক্রিয়ায় জড়িত। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের চাপা কান্না, অসহায় অবস্থা, দীর্ঘশ্বাস কি কান পেতে শুনতে পান? আজ সকলের মনে প্রশ্ন, এ কি অন্যায় অবিচার অত্যাচার, এ কি ধরনের নির্বাচন? ভোট দিতে যাওয়াটাই কি অপরাধ?

"স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক"-নূর হোসেনের আত্মা কি আজ ক্রন্দনরত? এত রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র মুক্ত করলাম, আজ মনে হচ্ছে আবার গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার বন্দি হয়ে গেল। জনগণ অসহায় নির্যাতিত।

মায়ামী।

১২.১২.২০০১